মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
PHYSIOLOGY OF HUMAN BODY : DIGESTION AND ABSORPTION

৩ অধ্যায়

আমরা সাধারণত জটিল খাদ্য গ্রহণ করি। এই জটিল খাদ্য পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন এনজাইমের প্রভাবে সরল খাদ্যে পরিণত হয় অর্থাৎ খাদ্য পাচিত বা হজম হয়। সুতরাং যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অদ্রবণীয় কঠিন ও জটিল খাদ্য বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় দ্রবণীয় তরল ও সরল খাদ্যে পরিণত হয়ে শোষণ ও আত্তীকরণের উপযোগী হয়, তাকে **পরিপাক** বলে। এক কথায়, জটিল খাদ্য সরল খাদ্যে পরিণত হওয়াকেই পরিপাক বলে। পৌষ্টিক গ্রন্থি থেকে পরিপাক রস নিঃসৃত হয়। পরিপাক রসস্থিত এনজাইম খাদ্য পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মানবদেহের খাদ্য পরিপাকের প্রধান স্থানগুলো হলো মুখবিবর, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র। যেসব পৌষ্টিকগ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। আমরা যেসব খাদ্য উপাদান গ্রহণ করি তাদের মধ্যে ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি তরল খাদ্যে পরিণত হওয়ায় পরিপাকনালিতে সরাসরি শোষিত হয়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

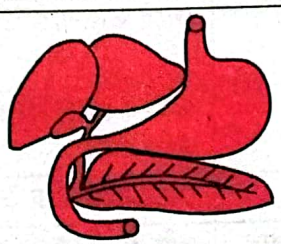
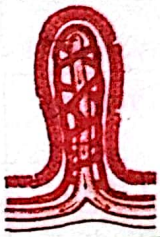

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১১)
১. মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩. যকৃতের সঞ্চয়ী এবং বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র এবং গ্যাস্ট্রিক হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (Major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন হতে রক্তনালিকা এবং ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. **ব্যবহারিক** ○ পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ১০. স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে সংঘটিত পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ ○ যকৃৎ ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের ○ পরিপাক ○ শোষণ ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● **ব্যবহারিক** ○ যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ (section) এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ● স্থূলতা ○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতিরোধ

পরিপাক (Digestion)

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানসমূহ (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে দ্রবণীয়, সরল এবং শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয় তাকে **পরিপাক** (digestion) বা **হজম** বলে। মানুষ **সর্বভুক** (omnivorus) প্রাণী। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এ ছয় ধরনের খাদ্যই মানুষ গ্রহণ করে। এসব খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন, পানি ও খনিজ লবণ কোষ কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হয়, ফলে মানুষের এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল বিধায় এগুলোকে পরিপাকের প্রয়োজন হয়। মানুষ অধিকাংশ খাদ্যকে সিদ্ধ অবস্থায় খেয়ে থাকে। কারণ মানুষের পরিপাকতন্ত্র কাঁচা খাদ্য হজমের উপযোগী নয়।

যে খাদ্যে ৬টি খাদ্য উপাদানই (শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি) সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং খাদ্য গ্রহণে কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাকে **সুষম খাদ্য** (balance diet) বলে।

সুষম খাদ্যের প্রাত্যহিক চাহিদা : একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিম্নলিখিত হারে দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক–

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫-৬০০ গ্রাম	দেহে তাপশক্তি উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
আমিষ (Protein)	১০০-১৫০ গ্রাম	দেহের কোষ গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০-৫৫ গ্রাম	দেহে তাপশক্তি উৎপাদন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ।
ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০-৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
খনিজ লবণ (Mineral salts)	৮-১০ গ্রাম	দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
পানি (Water)	২-৩ লিটার	কোষের প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালি (Process of Human Digestion)

মানুষের **বহিঃকোষীয়** (extra-celluler) ও **অন্তঃকোষীয়** (intra-celluler) উভয় ধরনের পরিপাক সংঘটিত হয়। পৌষ্টিকনালির গহ্বরের ভেতরে বহিঃকোষীয় এবং পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীরে শোষণক্ষম কোষের ভেতর অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন হয়। যে তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে **পরিপাকতন্ত্র** বা **পৌষ্টিকতন্ত্র** (digestive system) বলে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিক গ্রন্থি**। মানুষের পৌষ্টিকনালির অন্তর্গত **মুখবিবর, পাকস্থলী** ও **ক্ষুদ্রান্ত্রই** হলো খাদ্য পরিপাকের স্থান। মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। তবে পরিপাক দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যথা– (১) **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া** ও (২) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**।

(১) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Mechanical process) : রাসায়নিক পরিপাকের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করাই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যেমন– মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দাঁত দ্বারা চিবানো, লালার মিউসিনের সঙ্গে মিশে সিক্ত ও পিচ্ছিল হওয়া, জীবাণুমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রে HCl, পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রসের প্রভাবে রাসায়নিক পরিপাকের পরিবেশ তৈরি, এনজাইমের সক্রিয়করণ এবং সর্বোপরি খাদ্যবস্তুগুলো মণ্ডে পরিণত হওয়া ইত্যাদি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঘটে।

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical process) : এটি পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের বিভিন্ন এনজাইম (যেমন– মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থির লালা রসের এনজাইম ও বিভিন্ন পৌষ্টিক গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এনজাইম) খাদ্যের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো (যেমন– জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ বস্তু) ভেঙে দেহকোষের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত করে।

পরিপাকে পাচক এনজাইমের ভূমিকা (Role of Digestive Enzymes in Digestion)

মানুষের বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্য পরিপাকে তিন ধরনের পাচক এনজাইম বা পরিপাককারী এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যথা–

❐ **শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইম** : যেসব এনজাইম শর্করা বিশ্লিষ্ট করে তাদের **অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম** (amylolytic enzyme) বলে। যেমন– টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, আইসোমল্টেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাকটেজ ইত্যাদি।

শর্করার প্রধান উৎস : ভাত, রুটি, গম, যব, আলু, চিনি প্রভৃতি।

শর্করার চূড়ান্ত পরিণতি : শর্করা $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম}}$ গ্লুকোজ

❐ **আমিষ বা প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম** : যেসব এনজাইম প্রোটিন বিশ্লিষ্ট করে তাদের **প্রোটিওলাইটিক এনজাইম** (proteolytic enzyme) বলে। যেমন– পেপসিন, রেনিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামাইনোপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ ইত্যাদি।

আমিষের প্রধান উৎস : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সবজি, ফল ইত্যাদি।

আমিষের চূড়ান্ত পরিণতি : আমিষ $\xrightarrow{\text{প্রোটিওলাইটিক এনজাইম}}$ অ্যামিনো এসিড

❐ **স্নেহ বা লিপিড পরিপাককারী এনজাইম** : যেসব এনজাইম লিপিড বিশ্লিষ্ট করে তাদের **লাইপোলাইটিক এনজাইম** (lipolytic enzyme) বলে। যেমন– অগ্ন্যাশয় রসের **প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ** (pancreatic lipase) এবং আন্ত্রিক রসের **ইনটেসটিনাল লাইপেজ** (intestinal lipase), ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ ইত্যাদি।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস : ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি।

স্নেহ বস্তুর চূড়ান্ত পরিণতি : স্নেহ বস্তু $\xrightarrow{\text{লাইপোলাইটিক এনজাইম}}$ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System)

(এই অংশটুকু সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে জানা থাকা ভালো)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে **পরিপাকতন্ত্র** বা **পৌষ্টিকতন্ত্র** বলে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– **পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিক গ্রন্থি**।

(ক) পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal/Digestive Tract) : পরিপাকতন্ত্রের যে অংশ খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ ও অপাচ্য অংশ নিষ্কাশন করে তাকে **পৌষ্টিকনালি** বলে। এটি মুখছিদ্র হতে শুরু করে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং লম্বায় প্রায় ১০ মিটার। এর বিভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ–

১। **মুখছিদ্র** (Mouth opening) : পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসিকা ছিদ্রের নিচে এক আড়াআড়ি ছিদ্র, যা উপরের ও নিচের ঠোঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ঠোঁটদ্বয় খোলা ও বন্ধ করার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয়।

২। **মুখবিবর বা মুখগহ্বর** (Buccal cavity/Mouth cavity) : মুখছিদ্রের ঠিক পেছনে অবস্থিত গহ্বরটি মুখগহ্বর বা মুখবিবর। মুখছিদ্রের মাধ্যমে এই গহ্বরে খাদ্য প্রবেশ করে। এটি উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই গহ্বরে দাঁত ও জিহ্বা থাকে। এতে লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। মুখবিবরের ছাদকে **তালু** (palate) বলে।

কাজ : মুখবিবরে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাদ্যবস্তু চর্বিত, পেষিত ও লালামিশ্রিত হয়ে গলাধঃকরণ উপযোগী হয়।

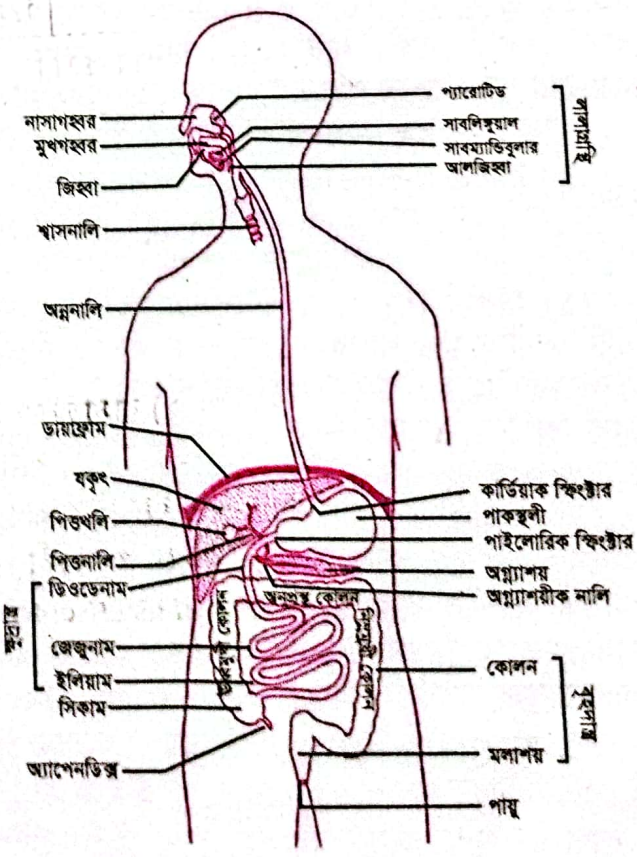

চিত্র ৩.১ : মানুষের পরিপাকতন্ত্র (সরলীকৃত চিত্র)

৩। **গলবিল** (Pharynx) : এটি মুখবিবর ও অন্ননালির মধ্যবর্তী অংশ। এটি প্রায় ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও চওড়া ফানেলাকার অংশ। এই অংশের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখবিবর থেকে অন্ননালিতে প্রবেশ করে। গলবিল তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা– i. নাসাগহ্বরের সাথে সংযোগকারী নাসাগলবিল (nasopharynx), ii. মুখবিবরের সঙ্গে সংযোগকারী মুখগলবিল (oropharynx) এবং iii. স্বরনালির (larynx) সঙ্গে সংযোগকারী স্বরগলবিল (laryngopharyx)।

কাজ : খাদ্য ও শ্বাসবায়ু চলাচলের সাধারণ পথ হিসেবে কাজ করে।

৪। **অন্ননালি** (Oesophagus) : গলবিলের পরবর্তী পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত ২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ নলাকার অংশটিকে অন্ননালি বলে। এটি পৌষ্টিকনালির সবচেয়ে পেশিবহুল অংশ।

কাজ : অন্ননালির ক্রমসংকোচনের (peristalsis) মাধ্যমে খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

৫। **পাকস্থলী** (Stomach) : পাকস্থলী ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। পাকস্থলীর চারটি অংশ থাকে, যথা– (ক) **কার্ডিয়াক প্রান্ত** (cardiac end) অর্থাৎ অন্ননালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল (বা এটি পাকস্থলীর হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন অংশ), (খ) **ফানডাস** (fundus) অর্থাৎ পাকস্থলীর বাম পাশে গম্বুজাকৃতির অংশ, (গ) **দেহ** (body) অর্থাৎ পাকস্থলীর প্রধান ও মাঝখানের অংশ এবং (ঘ) **পাইলোরিক অঞ্চল** (pyloric region) অর্থাৎ পাকস্থলীর পশ্চাৎভাগে ডিওডেনাম সংলগ্ন অংশ। কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অঞ্চলে বৃত্তাকার পেশিবলয় থাকে। এদের যথাক্রমে **কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার** (cardiac sphincter) ও **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) বলে। পাকস্থলীতে দুটি বক্রতা দেখা যায়, যথা– ডান অবতল কিনারা তথা ছোট বাঁক এবং বাম উত্তল কিনারা তথা বড় বাঁক।

পাকস্থলীর প্রাচীর **সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা** ও **মিউকোসা** নামক পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরে **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** বিদ্যমান।

কাজ : পাকস্থলীতে সাময়িকভাবে খাদ্য জমা থাকে, খাদ্য জীবাণুমুক্ত হয় এবং কিছু খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।

৬। **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine) : পাইলোরিক পাকস্থলীর পশ্চাৎ অংশ থেকে শুরু করে বৃহদন্ত্রের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৬ -৭ মিটার লম্বা নলাকার অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে **ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার** (ileocolic sphincter) নামক একটি পেশিবলয় বিদ্যমান। ক্ষুদ্রান্ত্র ৩টি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা–

(১) **ডিওডেনাম** (Duodenum) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের পাকস্থলী সংলগ্ন অংশ এবং প্রায় ২৫-৩০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এটি দেখতে 'U' আকৃতি এবং পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয়নালি এই অংশে উন্মুক্ত হয়। ডিওডেনামে **ব্রুনার গ্রন্থি** (Bruner's gland) দেখা যায়।

(২) **জেজুনাম** (Jejunum) : এটি ডিওডেনামের পরবর্তী প্রায় ২-৩ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অংশ।

(৩) **ইলিয়াম** (Ileum) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ যা বৃহদন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের সবচেয়ে দীর্ঘতম অংশ, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩-৪ মিটার। ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা স্তরে যে নলাকার গ্রন্থি অবস্থিত তাদের **আন্ত্রিক গ্রন্থি** বলে। এর প্রাচীরে **ভিলাই** (villi) নামক অসংখ্য অভিক্ষেপ থাকে। আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রস এবং অগ্ন্যাশয় রস খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন করে এবং অন্ত্রের ভিলাই খাদ্যসার শোষণ করে।

কাজ : ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তু পরিপাক ও খাদ্যসার শোষিত হয়।

৭। **বৃহদন্ত্র** (Large intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী মোটা নলাকৃতি অংশকে বৃহদন্ত্র বলে। বৃহদন্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৪-৭ সেন্টিমিটার। এটি ইলিয়ামের শেষ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহদন্ত্রে অধিক সংখ্যক মিউকাস ক্ষরণকারী গবলেট কোষ থাকে। বৃহদন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে। যথা–

(১) **সিকাম** (Caecum) : সিকাম বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থল থেকে বিস্তৃত। এটি দেখতে বদ্ধ থলির মতো। বদ্ধ প্রান্তটি নিম্নমুখী এবং খোলা প্রান্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে কোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। সিকামের নিচের দিকে বহিঃবৃদ্ধিরূপে একটি অংশ দেখা যায়, যা মিউকাসঝিল্লি নির্মিত কপাটিকায় সুরক্ষিত থাকে, একে **ভার্মিফর্ম অ্যাপেনডিক্স** (vermiform appendix) বলে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহ সৃষ্টি হলে একে **অ্যাপেনডিসাইটিস** (appendicitis) বলে।

(২) **কোলন** (Colon) : এটি বৃহদন্ত্রের দীর্ঘতম অংশ। সিকামের পরের ১৫-১৯ সেন্টিমিটার লম্বা অংশই কোলন। এর যে অংশ উপরের দিকে উঠেছে তা **ঊর্ধ্বগামী কোলন** (ascending colon), বামদিকে আড়াআড়ি অবস্থিত অংশকে **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon) এবং এর পরবর্তী যে অংশ বাম পাশ ঘেঁষে নিচের দিকে নেমেছে তাকে **নিম্নগামী কোলন** (descending colon) বলে। নিম্নগামী কোলনের যে অংশ ফাঁসের মতো এবং মলাশয়ে যুক্ত তাকে **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon) বলে।

(৩) **মলাশয়** (Rectum) : বৃহদন্ত্রের শেষপ্রান্তে শ্রোণিদেশে অবস্থিত অনেকটা থলির মতো অংশ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ সেন্টিমিটার। মলাশয়ের নিম্নাংশ স্ফীত হয়ে **মলাশয়িক অ্যাম্পুলা** (rectal ampulla) গঠন করে।

কাজ : বৃহদন্ত্রে মল তৈরি হয়, পানি ও স্যালাইন শোষিত হয় এবং খাদ্যাংশের গাঁজন ও পচন ঘটে। এছাড়াও এখানে জীবাণু কর্তৃক ভিটামিন B_{12} ও K প্রস্তুত হয়।

৮। **পায়ুছিদ্র** (Anus) : মলাশয় পায়ুছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত। পায়ু অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ এই দুটি স্ফিংক্টারে আবদ্ধ। অন্তঃস্থটি মসৃণ পেশিনির্মিত ও অনৈচ্ছিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বহিঃস্থটি অমসৃণ পেশিনির্মিত এবং ঐচ্ছিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : পায়ুপথে মলত্যাগ হয়।

(খ) পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি (Digestive Glands) : যেসব গ্রন্থির ক্ষরিত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের **পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি** বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি বিদ্যমান, যথা– **লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। [বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির বিবরণ- পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৯ দ্রষ্টব্য] মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা- (১) খাদ্য ও পানির গলাধঃকরণ, (২) পৌষ্টিক নালিতে খাদ্যের সঞ্চালন, (৩) খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক, (৪) খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক, (৫) পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ এবং (৬) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন।

দাঁত ও দন্ত সংকেত (Teeth and Dental Formula)

মানুষের মুখবিবরে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে বিদ্যমান শক্ত, শৃঙ্গায়িত গঠনকে **দাঁত** (teeth) বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের উপরের ও নিচের চোয়ালে ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানুষের দাঁত **ডাইফায়োডন্ট, থেকোডন্ট** এবং **হেটেরোডন্ট** প্রকৃতির হয়।

(ক) ডাইফায়োডন্ট (Diphyodont) : মানুষের দাঁত দু'বার ওঠে। প্রথমবার শিশুকালে ২০টি **দুধে দাঁত** (milky teeth) ওঠে, দ্বিতীয়বার দুধে দাঁত পড়ে গিয়ে ৮-১০ বছরের মধ্যে **স্থায়ী দাঁত** (parmanent teeth) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ১৮-২৪ বছরের মধ্যে মানুষের মুখে সর্বমোট ৩২টি স্থায়ী দাঁত পরিলক্ষিত হয়।

(খ) থেকোডন্ট (Thecodont) : মানুষের দাঁতগুলো চোয়ালের অস্থির গর্তে প্রোথিত থাকে।

(গ) হেটেরোডন্ট (Heterodont) : মানুষের উভয় চোয়ালে বিভিন্ন রকমের অর্থাৎ চার ধরনের স্থায়ী দাঁত থাকে। এগুলো হলো–

১। **কর্তন দাঁত** (Incisors teeth) : প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশের সামনে ২টি করে মোট ৮টি দাঁত থাকে। এগুলো ধারালো এবং খাদ্যবস্তুকে কাটতে ও ছিঁড়তে সাহায্য করে।

২। **ছেদন দাঁত** (Canine teeth) : কর্তন দাঁতের পরবর্তী কনিক্যাল আকৃতির দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ১টি করে মোট ৪টি দাঁত থাকে। এগুলো খাদ্যবস্তু কাটা ও ছেঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩। **অগ্রপেষণ দাঁত** (Pre-molar teeth) : ছেদন পরবর্তী দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি করে মোট ৮টি দাঁত থাকে।

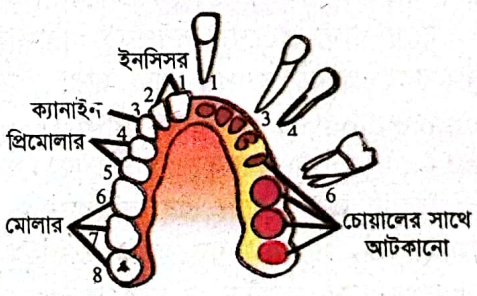

চিত্র ৩.২ : মানুষের বিভিন্ন ধরনের দাঁতের বিন্যাস

এগুলোর ঊর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। এরা খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করে। **শিশুদের দুধে দাঁতে প্রিমোলার বা অগ্রপেষণ দাঁত থাকে না।**

৪। **পেষণ দাঁত** (Molar teeth) : অগ্রপেষণের পরবর্তী দাঁত। প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ৩টি করে মোট ১২টি দাঁত থাকে। এদের ঊর্ধ্বপ্রান্ত অনেক চওড়া ও খাঁজকাটা কাস্পযুক্ত। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি অনেক পরে উঠে। একে **আক্কেল দাঁত** (wisdom teeth) বলে। এরাও খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে সাহায্য করে।

দন্ত সংকেত (Dental formula) : **যে সংকেতের সাহায্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁতের সংখ্যা, ধরন ও বিন্যাস বা অবস্থান প্রকাশ করা হয়, তাকে দন্ত সংকেত বলে।** বিভিন্ন দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা দাঁতের ধরন বোঝানো হয়। যেহেতু প্রতিটি চোয়ালের দুটি অর্ধাংশই হুবহু একরকম সেহেতু দন্ত সংকেত দ্বারা প্রাণীর মোট অর্ধেক দাঁত দেখানো হয়। দন্ত সংকেতে একটি আড়াআড়ি রেখায় ওপরে ও নিচে বিভিন্ন দাঁতের নামের প্রথম অক্ষর ও সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। প্রতি চোয়ালের দাঁতের সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে প্রাণীর মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে মানুষের দন্ত সংকেত হলো–

(ক) শিশুদের (দুধে দাঁত) দন্ত সংকেত : $\frac{I_2C_1M_2}{I_2C_1M_2} = \frac{5\times2}{5\times2} = 10+10 = 20$

(খ) পরিণত মানুষের (স্থায়ী দাঁত) দন্ত সংকেত : $\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8\times2}{8\times2} = 16+16 = 32$

ব্যাখ্যা : কিশোরদের প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি ইনসিসর, ১টি ক্যানাইন ও ২টি মোলার দাঁত বিদ্যমান। পরিণত মানুষের প্রতি চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে ২টি ইনসিসর, ১টি ক্যানাইন, ২টি প্রিমোলার ও ৩টি মোলার দাঁত এবং মুখে সর্বমোট ৩২টি দাঁত বিদ্যমান।

জিহ্বা (Tongue)

মুখবিবরের মেঝেতে অবস্থিত মাংসল, সঞ্চারণশীল ও সংবেদন অঙ্গটিকে **জিহ্বা** বলে। জিহ্বা আবরণী কলা, পেশি ও গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। জিহ্বার আবরণী কলায় স্বাদকোরক বা স্বাদকুঁড়ি (taste buds) এবং প্যাপিলি (papillae, sing. papilla) থাকে। স্বাদকোরক খাদ্যবস্তুর স্বাদগ্রহণে সাহায্য করে।

জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টতা, পশ্চাৎভাগে তিক্ততা, দু'পাশে অম্লতা এবং মধ্যভাগে লবণাক্ততা স্বাদগ্রাহী স্বাদকোরক থাকে। ৫-১০ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘসায় স্বাদকোরক নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়। জিহ্বার পেশি ঐচ্ছিক ও তীর্যক ডোরাযুক্ত। জিহ্বায় তিন প্রকার গ্রন্থি থাকে। যথা– **শ্লেষ্মাক্ষরণকারী গ্রন্থি, সেরাস গ্রন্থি** এবং **লসিকা গ্রন্থি**। লসিকা গ্রন্থিগুলো সম্মিলিতভাবে **লিঙ্গুয়াল টনসিল** (lingual tonsil) গঠন করে।

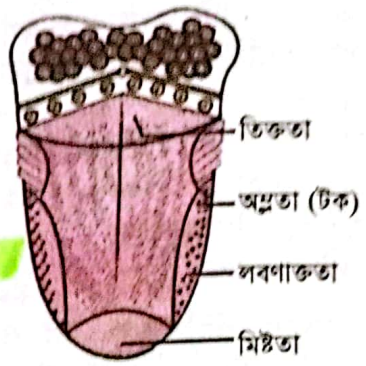

চিত্র ৩.৩ : বিভিন্ন স্বাদ কোরক

জিহ্বার কাজ : স্বাদ গ্রহণ, চর্বণ, আস্বাদন, গলাধঃকরণ, কথা বলা এবং শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ ক্ষরণ করা।

নিচে মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩.১ মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion in Mouth/Buccal Cavity)

মুখছিদ্রের ঠিক পেছনে অবস্থিত গহ্বরটি মুখগহ্বর বা মুখবিবর। মুখছিদ্রের মাধ্যমে এই গহ্বরে খাদ্য প্রবেশ করে। এটি উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই গহ্বরে দাঁত ও জিহ্বা থাকে। এতে লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। মুখবিবরের ছাদকে **তালু** (palate) বলে। মুখবিবরে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাদ্যবস্তু চর্বিত, পেষিত ও লালামিশ্রিত হয়ে গলাধঃকরণ উপযোগী হয়।

মুখে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পরিপাক প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুখে খুব অল্পই পরিপাক হয়। কারণ খাদ্যবস্তু মুখগহ্বরে প্রবেশের পর দাঁত দ্বারা কর্তন, চর্বণ ও পেষণের পাশাপাশি **প্যারোটিড** (parotid), **সাবম্যান্ডিবুলার** (submandibular) ও **সাবলিঙ্গুয়াল** (sublingual) লালাগ্রন্থি (মুখগহ্বরে ৩ জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে) থেকে ক্ষরিত লালা (saliva) খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। লালাতে প্রধানত মিউসিন, টায়ালিন বা স্যালিভারি অ্যামাইলেজ, মল্টেজ এবং লাইসোজাইম ইত্যাদি থাকায় মুখগহ্বরে শুধু **কার্বোহাইড্রেট** (শর্করা) খাদ্যের পরিপাক হয়। লালারসে প্রোটিন ও চর্বি পরিপাককারী এনজাইম না থাকায় মুখগহ্বরে প্রোটিন ও লিপিড খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না। খাদ্যবস্তু পরিপাকে মুখগহ্বরের ভূমিকা নিম্নরূপ :

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion)

- মুখবিবরে খাদ্য গৃহীত হয়।
- দাঁত খাদ্যবস্তুকে কর্তন, চর্বণ ও পেষণে সাহায্য করে।
- জিহ্বা লালার সঙ্গে খাদ্য মিশ্রিত করে পিচ্ছিল করতে, খাদ্য গলাধঃকরণে এবং স্বাদকোরক খাদ্যের স্বাদ অনুভবে সাহায্য করে। লালা মিশ্রিত খাদ্যবস্তু **পিণ্ডাকার খাদ্যমণ্ড** (boles) ধারণ করে।
- লালারস মুখগহ্বরকে সিক্ত রেখে কথা বলায় সহায়তা করে।
- লালারসের পানিতে মুখগহ্বর, দাঁত, জিহ্বা ও মাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার হওয়ায় মুখের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।
- লালারস উষ্ণ এবং **উত্তেজক** (irrlont) খাদ্যবস্তুকে লঘু করে মিউকাস পর্দার ক্ষয় রোধ করে।
- **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।
- লালার **বাইকার্বনেট আয়ন** খাদ্যের আম্লিক অংশকে প্রশমিত করে, **থায়োসায়ানেট আয়ন** (thiocyanate ion) জীবাণু ধ্বংস করে।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion)

১। **শর্করা পরিপাক** : লালারসে অবস্থিত এনজাইম **টায়ালিন** জটিল সিদ্ধ শর্করাকে (শ্বেতসার) ভেঙে **মল্টোজে** পরিণত করে। লালারসে অল্প পরিমাণে **মল্টেজ** থাকে। এটি মল্টোজকে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

$$\text{জটিল শর্করা} \xrightarrow{\text{টায়ালিন}} \text{মল্টোজ}$$

$$\text{মল্টোজ} \xrightarrow{\text{মল্টেজ}} \text{গ্লুকোজ (২ অণু)}$$

২। **আমিষ পরিপাক** : মুখগহ্বরে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোনো এনজাইম থাকে না, ফলে আমিষের কোনো পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না। তবে আমিষ খাদ্য চর্বিত এবং লালামিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল ও নরম হয়।

৩। **স্নেহ পরিপাক** : মুখগহ্বরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকেরও কোনো এনজাইম থাকে না। এখানে স্নেহ জাতীয় খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে নরম হয়।

মুখগহ্বরে খাদ্যের এই পরিপাকের পর যে পিচ্ছিল মণ্ড তৈরি হয় তাকে **বোলাস** (bolus) বা **গ্রাস** বলে। বোলাস মুখ হতে **গলবিল** (pharynx) হয়ে গ্রাসনালি বা **অন্ননালিতে** (oesophagus) আসে এবং **ক্রমসংকোচনের** (peristalsis) মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছে। একে খাদ্য **গলাধঃকরণ** (swallowing) বলে। খাদ্য গিলবার সময় খাদ্যের কোনো অংশ যদি অন্ননালির মধ্যে প্রবেশ না করে সম্মুখদিকে অবস্থিত শ্বাসনালির মধ্যে প্রবেশ করে তখন হঠাৎ কাশির উদ্ভব হয় এবং শ্বাসনালি থেকে খাদ্যটিকে বের করার চেষ্টা চলে। একে **বিষম লাগা** বলে।

৩.২ পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে পরিপাক (Digestion of Different Parts in Stomach)

পাকস্থলী ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত থলির মতো অংশ। এটি ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া। মুখগহ্বর থেকে খাদ্যবস্তু অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলীতে আসে। পাকস্থলীর ৪টি অংশ থাকে, যথা–

১। **কার্ডিয়াক প্রান্ত** (Cardiac end) – অন্ননালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল (বা এটি পাকস্থলীর হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন অংশ)।

২। **ফানডাস** (Fundus)– পাকস্থলীর বাম পাশে গম্বুজাকৃতির অংশ। এ অংশে পাকস্থলীর ৬০-৮০% মিউকাস স্তর অবস্থান করে।

৩। **দেহ** (Body)– পাকস্থলীর প্রধান ও মাঝখানের অংশ। পাকস্থলীতে দুটি বক্রতা দেখা যায়, যথা– ডান অবতল কিনারা তথা ছোট বাঁক এবং বাম উত্তল কিনারা তথা বড় বাঁক।

৪। **পাইলোরিক অঞ্চল** (Pyloric region) – পাকস্থলীর পশ্চাৎভাগে ডিওডেনাম সংলগ্ন অংশ।

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অঞ্চলে বৃত্তাকার পেশিবলয় থাকে। এদের যথাক্রমে **কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার** (cardiac sphincter) ও **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) বলে।

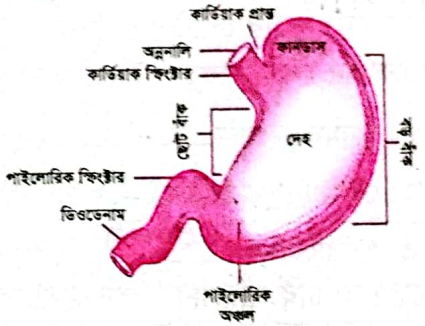

চিত্র ৩.৪ : পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ

পাকস্থলীর প্রাচীর পর্যায়ক্রমে ৫টি প্রধান স্তরে বিভক্ত। যথা– **সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা** ও **মিউকোসা**। পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পাকস্থলীর মিউকোসা স্তরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন (প্রায় ৪ কোটি) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থিগুলো গ্যাস্ট্রিক রস ধারণ করে। প্রতিদিন প্রায় ২ লিটার **গ্যাস্ট্রিক রস** (gastric juice) বা **পাকরস** নিঃসরণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষসমূহ পরিপাক সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত উপাদানগুলো ক্ষরণ করে।

১। **পেপটিক কোষ বা চিফ কোষ বা জাইমোজেনিক কোষ** (Peptic cell/Chief cell/Zymogenic cell) – পেপসিন (নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন), রেনিন, জিলেটিনেজ, লাইপেজ ইত্যাদি ক্ষরণ করে।

২। **প্যারাইটাল বা অক্সিনটিক কোষ** (Parietal/Oxyntic cell) – HCl ক্ষরণ করে।

৩। **আরজেন্টাফিন কোষ** (Argentaffine cell) – হরমোন ক্ষরণে ও এটি থেকে উৎপন্ন **গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর** (gastric intrinsic factor) Vit B_{12} শোষণে সহায়তা করে।

৪। **মিউকাস কোষ** (Mucous cell) – মিউকাস ক্ষরণ করে।

৫। **গ্যাস্ট্রিন কোষ বা জি (G) কোষ** (Gastrin cell/G-cell) – **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরণ করে, যা গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রথমেই **গ্যাস্ট্রিন হরমোন** পাকস্থলীতে খাদ্য গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাকস্থলীতে খাদ্য গ্রহণের পর এর প্রাচীরের অন্তর্গাত্রে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস বা জুস নিঃসৃত হয়। এর ৯৯.৪৫%-ই পানি। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান এনজাইমসমূহ খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক (Digestion in stomach)

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion)

১। পাকস্থলী গৃহীত খাদ্যবস্তুকে দেহে সাময়িকভাবে জমা রাখে এবং বিচলন প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুকে গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচকরসের সঙ্গে মিশে যেতে সাহায্য করে।

২। মিউসিন নামক একটি প্রোটিন মিউকাসের প্রধান উপাদান। পাকস্থলীর মিউকাস কোষ থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়ে পাকস্থলীর প্রাচীরে একটি গাঢ় আবরণের সৃষ্টি করে। ফলে পাকস্থলীর প্রাচীর HCl বা পেপসিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।

৩। খাদ্যে উপস্থিত পাকস্থলীর প্রাচীর কর্তৃক নিঃসৃত HCl, সব ধরনের খাদ্যবস্তুকে সামান্য পরিমাণ আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করতে পারে। এ ছাড়া HCl **অ্যান্টিসেপটিক** রূপে কাজ করে। অর্থাৎ খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য বিজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করে।

৪। পাকস্থলীর পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে পিষে **মণ্ড** বা **কাইমে** (chyme) পরিণত করে। HCl রক্তের অম্লক্ষারের সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫। এটি ভিটামিন B_{12} শোষণ এবং পরোক্ষভাবে লোহিত রক্তকণিকার বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

৬। HCl নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে আমিষ পরিপাকে সহায়তা করে।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion)

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলীর পাচক রসে শর্করা পরিপাককারী কোনো এনজাইম থাকে না। তাই পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক হয় না। তবে HCl-এর সাহায্যে সুক্রোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক রসে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম **পেপসিন, পেপসিনোজেন** (জাইমোজেন) রূপে (নিষ্ক্রিয়) নিঃসৃত হয়, যা HCl এসিডের সহায়তায় সক্রিয় **পেপসিনে** পরিণত হয়। পেপসিন প্রোটিনকে **প্রোটিওজ** ও **পেপটোনে** পরিণত করে। **রেনিন** (rennin, নিষ্ক্রিয় অবস্থা **প্রোরেনিন,** যা HCl এসিডের সহায়তায় সক্রিয় **রেনিনে** পরিণত হয়) দুধের প্রোটিন কেসিনকে Ca^{++} এর উপস্থিতিতে **প্যারাকেসিনে** বা **কেসিনোজেনে** পরিণত করে। অতঃপর প্যারাকেসিন পেপসিনের কার্যকারিতায় পরবর্তীতে **পেপটোন** ও **প্রোটিওজে** পরিণত হয়।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন + প্রোটিওজ

২. কেসিন (দুগ্ধ আমিষ) + পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন + প্রোটিওজ

স্নেহ বা চর্বি পরিপাক : পাকস্থলীতে পিত্তলবণের অভাবে এবং অম্লধর্মী পরিবেশের জন্য **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** তেমন কাজ করতে পারে না। লাইপেজের প্রভাবে অতি অল্পমাত্রায় স্নেহদ্রব্য বিশ্লিষ্ট হয়ে **ফ্যাটি এসিড** এবং **গ্লিসারলে** পরিণত হয়। এটি সাধারণত মাখনের চর্বির (Butter fat) উপর কাজ করে।

স্নেহদ্রব্য $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

পাকস্থলীতে খাদ্য **২-৬ ঘণ্টা** অবস্থান করে। পাকস্থলীতে পরিপাক সম্পন্ন হওয়ার পর খাদ্যের যে দানা তৈরি হয় তাকে **কাইম** (chyme) বা **মণ্ড** বলে। কাইম ক্রমসংকোচনের মাধ্যমে **পাইলোরিক স্ফিংক্টার** (pyloric sphincter) অতিক্রম করে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

পাকস্থলী বা অন্ত্র নিজে হজম হয় না কেন?

পাকস্থলী এবং অগ্ন্যাশয়ের অসংখ্য সনাল বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি **প্রোটিয়েজ** (আমিষ হজমের এনজাইমকে প্রোটিয়েজ বলে, যেমন– পেপসিন, ট্রিপসিন এক একটি প্রোটিয়েজ) এনজাইম তৈরি করে। প্রোটিয়েজ দ্বারা পাকস্থলী বা অন্ত্রের লুমেনে আমিষ পরিপাক হলেও এসব প্রোটিয়েজ সৃষ্টিকারী গ্রন্থিকোষগুলো প্রোটিন দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা পরিপাক হয় না। এর কারণ–

প্রথমত : প্রোটিয়েজগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। যেমন– **পেপসিন** নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে ক্ষরিত হয় এবং HCl এর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত সক্রিয় হয় না। একই ভাবে **ট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে ক্ষরিত হয়ে ডিওডেনাম প্রাচীরের এন্টারোকাইনেজ এনজাইম দ্বারা সক্রিয় হয়।

দ্বিতীয়ত : পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরের কিছু কোষ এবং লালাগ্রন্থি **মিউকাস** উৎপন্ন করে। মিউসিন নামক একটি প্রোটিন মিউকাসের প্রধান উপাদান। পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রাচীরের ভিতরের গাত্র সব সময় মিউকাসের গাঢ় আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। সম্ভবত মিউকাসের এ আবরণের জন্যই আমিষ হজমকারী এনজাইমসমূহ পাকস্থলী বা অন্ত্র প্রাচীরের কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

তৃতীয়ত : কোষে কোনো **অ্যান্টিএনজাহম** থাকার সম্ভাবনা আছে, যার জন্য এনজাইমগুলো পাকস্থলী বা অন্ত্র প্রাচীরে অবস্থিত সজীব কোষের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। তবে ব্যাকটেরিয়ার (Helicobacter pylori) সংক্রমণে কিংবা NSAID ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে।

❑ **কাজ :** (i) পাকস্থলীতে যান্ত্রিক পরিপাক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। (ii) পাকস্থলীতে খাদ্যের পরিপাকে পৌষ্টিক গ্রন্থির ভূমিকা বর্ণনা কর। (iii) পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিকোষগুলোর নাম ও কাজ লেখ। (iv) পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করে কিন্তু নিজে পরিপাক হয় না– বিশ্লেষণ কর। (v) আমাদের গৃহীত জটিল খাদ্যবস্তুর পরিপাক আবশ্যকীয়– উক্তিটির যৌক্তিকতা উল্লেখ কর।

৩.৩ খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ
(Major Action of the Different Parts of Intestine in Digestion of Food Material)

সকল ধরনের জটিল খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণের প্রধান স্থান হলো ক্ষুদ্রান্ত্র। এখানে খাদ্যবস্তুর যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(ক) যান্ত্রিক পরিপাক : পাকস্থলী থেকে কাইম ডিওডেনামে প্রবেশের পর ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির সংকোচন ও প্রসারণে খাদ্য পরিপাক রসের (পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস) সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত হয় এবং **পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালনের** (peristaltic movement) মাধ্যমে খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ধীরভাবে প্রবাহিত হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে ৩-৫ ঘণ্টা অবস্থান করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কাজগুলো হলো–

১। **খাদ্যমণ্ডের এসিড প্রশমন :** পিত্তরসের বাইকার্বনেট পাকস্থলী থেকে আগত খাদ্যমণ্ডের এসিডকে প্রশমিত করে ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্যান্য এনজাইমের ক্রিয়াশীলতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২। **খাদ্যবস্তু পিচ্ছিলকরণ :** আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৩। **ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর সুরক্ষা : ব্রুনার্স গ্রন্থি** (brunner's gland) ও **গবলেট কোষ** (goblet cell) থেকে মিউকাস তৈরি হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।

৪। **জীবাণু নিয়ন্ত্রণ :** পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর ক্রিয়া কমায়।

৫। **ক্রমসংকোচন :** পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।

৬। **কোলেসিস্টোকাইনিনের ক্রিয়া :** এই হরমোনটি পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে পিত্তাশয়ের সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।

৭। **স্নেহ পদার্থের ইমালসিফিকেশন :** পিত্তলবণ ফ্যাটকে ইমালসিফাই করে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। পিত্তরস কোলেস্টেরলকে শোষণে সাহায্য করে।

৮। **pH নিয়ন্ত্রণ :** পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রস অন্ত্রের pH নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। **অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ :** কোলেসিস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজাইমিন (CCK-PZ) অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে সহায়তা করে এবং বাইকার্বনেটের ক্ষরণ বাড়ায়।

(খ) রাসায়নিক পরিপাক : পাকস্থলীতে অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য **কাইম** (chyme) পাইলোরিক স্ফিংক্টারের নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। ডিওডেনামে প্রবেশের পর কাইমের প্রভাবে ডিওডেনাম ও ঊর্ধ্ব জেজুনাম থেকে **সিক্রেটিন** (secretin) এবং **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোনদ্বয়ের প্রভাবে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়ে ডিওডেনামে এসে পৌঁছায়। একইভাবে ডিওডেনাম নিঃসৃত **কোলেসিস্টোকাইনিন** হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি সংকুচিত হয়। ফলে পিত্তনালির মধ্য দিয়ে পিত্ত এসে ডিওডেনামে পৌঁছায়। এখানে অগ্ন্যাশয় রস পিত্তরসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। খাদ্যবস্তু ঊর্ধ্ব জেজুনামে প্রবেশ করার পর এর প্রভাবে **এন্টারোক্রাইনিন** (enterocrinin) হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোনের প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে খাদ্য পরিপাকে বিভিন্ন পরিপাক রসের **(পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস)** ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

(ক) পিত্তরসের ভূমিকা (Role of bile)

১। পিত্তরস ক্ষারজাতীয় পদার্থ। পিত্তরসে কোনো এনজাইম না থাকলেও পরিপাকের জন্য পিত্তরস অপরিহার্য। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বনেট উপাদান পাকস্থলী থেকে আগত HCl-কে প্রশমিত করে ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন।

২। পিত্তরসের পিত্তলবণ (সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টরোকোলেট) চর্বিকে ছোট ছোট দানায় পরিণত করে এবং পানির সঙ্গে মিশ্রণযোগ্য করে তোলে। এই পদ্ধতিকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে। ফলে লাইপেজ দ্বারা চর্বি সহজেই পরিপাক হয়।

(খ) অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা (Role of Pancreatic Juice) **:** ক্ষারীয় অগ্ন্যাশয় রস অম্লীয় পাকরসকে প্রশমিত করে। প্রতিদিন ৬০০-৮০০ মিলি. অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরিত হয়। অগ্ন্যাশয় রসের মধ্যে অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ, লাইপেজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে।

☐ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** (amylase) এনজাইম জটিল শর্করা স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ

২। **মল্টেজ** (maltase) এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

$$\text{মল্টোজ} \xrightarrow{\text{মল্টেজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

☐ আমিষ পরিপাক

১। **ট্রিপসিন** (trypsin) এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে নিঃসৃত হয়। ডিওডেনামের মিউকাস স্তর নিঃসৃত এন্টারোকাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

$$\text{প্রোটিওজ ও পেপটোন} \xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}} \text{পলিপেপটাইড}$$

২। **কাইমোট্রিপসিন** (chymotripsin) নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ট্রিপসিন নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনকে সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত করে, যা প্রোটিওজ ও পেপটোনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

$$\text{প্রোটিওজ ও পেপটোন} \xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}} \text{পলিপেপটাইড}$$

৩। **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** (carboxypeptidase) এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

$$\text{পলিপেপটাইড} \xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}} \text{ডাইপেপটাইড} + \text{অ্যামিনো এসিড}$$

৪। **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** (aminopeptidase) এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

$$\text{পলিপেপটাইড} \xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}} \text{অ্যামিনো এসিড}$$

৫। **ট্রাইপেপটাইডেজ** (tripeptidase) এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

$$\text{ট্রাইপেপটাইড} \xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}} \text{অ্যামিনো এসিড}$$

৬। **ডাইপেপটাইডেজ** (dipeptidase) এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

$$\text{ডাইপেপটাইড} \xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}} \text{অ্যামিনো এসিড}$$

৭। **কোলাজিনেজ** (colaginase) এনজাইম কোলাজেন (মাছ ও মাংসে বিদ্যমান) ভেঙে সরল পেপটাইড উৎপন্ন করে।

$$\text{কোলাজেন} \xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}} \text{সরল পেপটাইড}$$

৮। **ইলাস্টেজ** (elastase) এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

$$\text{ইলাস্টিন} \xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}} \text{পেপটাইড}$$

☐ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ** (lypase) এনজাইম পিত্তলবণের উপস্থিতিতে চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

$$\text{চর্বি (লিপিড)} \xrightarrow{\text{লাইপেজ}} \text{ফ্যাটি এসিড} + \text{গ্লিসারল}$$

২। **ফসফোলাইপেজ** (phospholypase) এনজাইম ফসফোলিপিডসমূহ (লেসিথিন ও সেফালিন) থেকে ফ্যাটি এসিডকে পৃথক করে।

$$\text{ফসফোলিপিড} \xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}} \text{ফ্যাটি এসিড}$$

৩। **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** (cholesterol estarase) এনজাইম খাদ্যের কোলেস্টেরল এস্টারগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে এবং কোলেস্টেরল মুক্ত করে।

$$\text{কোলেস্টেরল এস্টার} \xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}} \text{ফ্যাটি এসিড} + \text{কোলেস্টেরল}$$

(গ) মেমব্রেন এনজাইম (আন্ত্রিক রস) এর ভূমিকা (Role of membrane enzyme) : পূর্বে মনে করা হতো যে, অন্ত্রের গ্রন্থিকোষগুলো থেকে এনজাইমসমৃদ্ধ **আন্ত্রিক রস** (intestinal juice) বা **সাক্কাস এন্টেরিকাস** (succus entericus) লুমেনে মুক্ত হয়। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্রের প্রাচীরের ক্ষরণ কোষ থেকে যেসব এনজাইম উৎপন্ন হয়– সেগুলো ওইসব কোষের উন্মুক্ত প্রান্তে মাইক্রোভিলাইয়ের গায়ে গ্লাইকোপ্রোটিনের সাথে যুক্ত থাকে, অন্ত্রীয় গহ্বরে উন্মুক্ত হয় না। কোষ আবরণী বা মেমব্রেনের সঙ্গে লেগে থেকেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বলে এদের **মেমব্রেন এনজাইম** বলে।

মেমব্রেন এনজাইমগুলোর মধ্যে আছে অ্যামিনোপেপটাইডেজ ও ডাইস্যাকারাইডেজসমূহ, যেমন– মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ও নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী এনজাইম।

❐ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিনে পরিণত করে।

$$\text{স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}} \text{মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন}$$

২। **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

$$\text{আইসোমল্টোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}} \text{মল্টেজ} + \text{গ্লুকোজ}$$

৩। **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

$$\text{মল্টোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{মল্টেজ}} \text{গ্লুকোজ (২ অণু)}$$

৪। **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করে।

$$\text{সুক্রোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{সুক্রেজ}} \text{১ অণু গ্লুকোজ} + \text{১ অণু ফ্রুক্টোজ}$$

৫। **ল্যাক্টেজ** এনজাইম ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

$$\text{ল্যাক্টোজ} + \text{পানি} \xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}} \text{১ অণু গ্লুকোজ} + \text{১ অণু গ্যালাক্টোজ}$$

❐ আমিষ পরিপাক

অ্যামিনোপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

$$\text{পলিপেপটাইড} \xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}} \text{অ্যামিনো এসিড}$$

❐ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ** এনজাইম ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইডকে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত করে।

$$\text{ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড (স্নেহকণা)} \xrightarrow{\text{লাইপেজ}} \text{মনোগ্লিসারাইড} + \text{ফ্যাটি এসিড}$$

২। **অ্যালকালাইন ফসফেটেজ** এনজাইমগুলো বিভিন্ন ধরনের ফসফেট যৌগকে (ফসফোলিপিড/লেসিথিন) আর্দ্রবিশ্লেষিত করে।

$$\text{ফসফোলিপিড/লেসিথিন} \xrightarrow{\text{অ্যালকালাইন ফসফেটেজ/ লেসিথিনেজ}} \text{গ্লিসারল} + \text{ফ্যাটি এসিড} + \text{ফসফোরিক এসিড} + \text{কোলিন ইত্যাদি}$$

৩। **মনোগ্লিসারাইডেজ** এনজাইম কোষের ভেতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

$$\text{মনোগ্লিসারাইড} \xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}} \text{ফ্যাটি এসিড} + \text{গ্লিসারল}$$

❐ নিউক্লিক এসিড পরিপাক

১। **নিউক্লিয়েজ** এনজাইম নিউক্লিক এসিডকে ভেঙে মনোনিউক্লিওটাইডে পরিণত করে।

$$\text{নিউক্লিক এসিড} \xrightarrow{\text{নিউক্লিয়েজ}} \text{মনোনিউক্লিওটাইড}$$

২। **নিউক্লিওটাইডেজ** এনজাইম নিউক্লিওটাইডসমূহ থেকে ফসফেট গ্রুপ অপসারণপূর্বক নিউক্লিওসাইডে পরিণত করে।

$$\text{নিউক্লিওটাইড} \xrightarrow{\text{নিউক্লিওটাইডেজ}} \text{নিউক্লিওসাইড}$$

৩। **নিউক্লিওসাইডেজ** এনজাইম নিউক্লিওসাইডসমূহকে বিশ্লিষ্ট করে পেন্টোজ সুগার এবং নাইট্রোজেন বেস (পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস) উৎপন্ন করে।

$$\text{নিউক্লিওসাইড} \xrightarrow{\text{নিউক্লিওসাইডেজ}} \text{পেন্টোজ সুগার} + \text{নাইট্রোজেন বেস}$$

❐ **কাজ :** (i) পরিপাক ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।/ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। (ii) ক্ষুদ্রান্ত্রে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক বর্ণনা কর। (iii) প্রাণিজ প্রোটিনের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা কর। (iv) বিভিন্ন রকম উৎসেচক খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে– বিশ্লেষণ কর।

৩.৪ পরিপাকগ্রন্থির কাজ (Role or Function of Digestive Gland)

১. লালাগ্রন্থি (Salivary Glands)

মানুষের মুখবিবরে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি থাকে। যথা–

১। প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid glands) : সবচেয়ে বড় এবং সেরাস প্রকৃতির গ্রন্থি। মুখমণ্ডলের একপাশে প্রত্যেক কানের সামান্য নিচে একটি করে দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি অবস্থিত। প্যারোটিড গ্রন্থি স্টেনসেন নালির (duct of stensen) মাধ্যমে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থি ভাইরাস আক্রান্ত হলে যে প্রদাহ হয় তাকে মাম্পস (mumps) বলে।

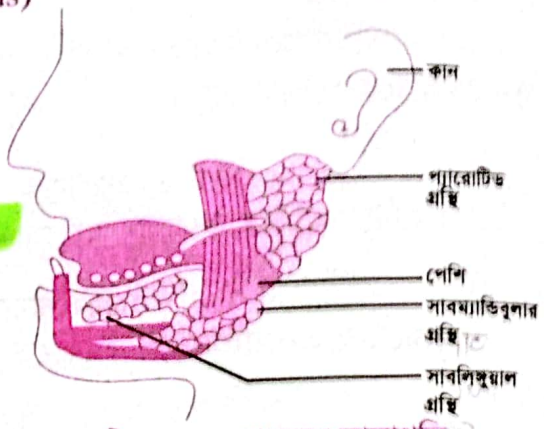

চিত্র ৩.৫ : মানুষের লালাগ্রন্থি

২। সাবম্যান্ডিবুলার বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি (Submandibular or Submaxillary glands) : প্রতিটি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের নিচের দিকে একটি করে মোট দুটি সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থাকে। এরা মিশ্র প্রকৃতির গ্রন্থি। এই গ্রন্থি মুখগহ্বরের মেঝেতে জিহ্বার নিচে হোয়ারটন নালির (Wharton's duct) মাধ্যমে ফ্রেনুলাম (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

৩। সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual glands) : জিহ্বার নিচে, মুখগহ্বরের মেঝের মিউকাস পর্দার নিচের দিকে অবস্থিত। এরা মিউকাস প্রকৃতির গ্রন্থি এবং এই গ্রন্থি কতগুলো সূক্ষ্ম নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরের মেঝেতে উন্মুক্ত হয়। এই নালিগুলোকে রিভিনাস নালি (ducts of rivinus) বলা হয়।

লালাগ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত অসংখ্য গোলাকার বা ডিম্বাকার রস ক্ষরণকারী থলি নিয়ে গঠিত। প্রতিটি থলির কেন্দ্রস্থলে একটি করে নালিকা থাকে। নালিকাগুলো পরস্পর একত্রিত হয়ে গ্রন্থির মূল নালিতে মিলিত হয়। নালিটি পরে মুখবিবরে প্রবেশ করে। গ্রন্থির কোষগুলো দু'ধরনের, যথা– **সেরাস কোষ** (serous cell) : **টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম** ক্ষরণ করে এবং **মিউকাস কোষ** (mucous cell) : **মিউকাস** ক্ষরণ করে।

লালাগ্রন্থির কাজ : লালাগ্রন্থি লালারস ক্ষরণ করে। লালারসের পানি ও মিউকাস খাদ্যবস্তুকে নরম ও পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালারসস্থিত এনজাইমগুলো শর্করা (শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্যবস্তু পরিপাকে অংশ নেয়। **লাইসোজাইম** খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।

লালা (Saliva)

লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **লালা** বা **লালারস** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক 1200-1500 মিলি লালা নিঃসরণ করে। লালা সামান্য অম্লধর্মী (pH : 6.02-7.05) ; আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002-1.012; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.07-0.34°C।

বৈশিষ্ট্য : কিছু কোষীয় উপাদান (ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি) এবং মিউসিনের উপস্থিতির জন্য লালা কিছুটা ঘোলাটে ও চটচটে হয়।

লালার উপাদান

1. পানি : 95.5% - 99.5%; 2. কঠিন পদার্থ : 0.5%

(a) অজৈব উপাদান : প্রায় 0.2%, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম ফসফেট, পটাশিয়াম থায়োসায়ানেট, বাইকার্বনেট ইত্যাদি অজৈব লবণ।

(b) জৈব উপাদান : প্রায় 0.3%

(১) এনজাইম : স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন, লাইসোজাইম, ফসফাটেজ, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইত্যাদি।

(২) অন্যান্য জৈব পদার্থ : মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

(৩) গ্যাসীয় উপাদান : 100 ml লালারসে দ্রবীভূত অবস্থায় CO_2 থাকে 50ml, O_2 থাকে 1.00 ml এবং N_2 থাকে 2.5ml.

লালার কাজ :

১। যান্ত্রিক কাজ : (ক) লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রেখে কথা বলতে সহায়তা করে; (খ) এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বণের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে; (গ) লালা উত্তপ্ত ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে; (ঘ) এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে।

২। খাদ্য পরিপাক : লালায় কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম থাকে। এরা জটিল শর্করাকে সরলে পরিণত করে।

৩। রেচন : কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য যেমন– ল্যাকটিক এসিড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ভারী ধাতু (Hg, Pb, As), থায়োসায়ানেট, মরফিন, অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন অ্যালকালয়েড ইত্যাদি লালার মাধ্যমে দেহ হতে রেচিত হয়।

৪। স্বাদ গ্রহণ : স্বাদ হলো এক ধরনের রাসায়নিক অনুভূতি। লালা খাদ্যের বিভিন্ন পদার্থকে দ্রবীভূত করে জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদগ্রহণে সহায়তা করে। কম লালা নিঃসরী মানুষ ডিসজিউসিয়া (dysgeusia) রোগে ভোগে।

৫। পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : লালারস দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিলে লালা নিঃসরণ কমে যায় এবং এতে তৃষ্ণা বোধ হয়। তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি পান করলে দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬। বাফার ক্রিয়া : লালারসের বাইকার্বনেট এবং অল্প পরিমাণে ফসফেট ও মিউসিন বাফার হিসেবে কাজ করে। লালারসের বাফার ক্রিয়া মুখগহ্বরের pH 6.2-7.4 তে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. যকৃৎ (Liver)

যকৃৎ মানবদেহের সবচেয়ে **বড় গ্রন্থি**। দেহের ওজনের প্রায় ৩-৫%। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যকৃতের ওজন প্রায় ১.৫-২.০০ কেজি। স্ত্রীলোকের ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম কম হয়। পরিপাকনালির বাইরে অবস্থান করলেও এটি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় বস্তুর প্রধান বিপাকীয় স্থল।

অবস্থান : মানবদেহের যকৃতটি ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে উদর-গহ্বরের উপরিভাগে পাকস্থলীর ডানদিকে অবস্থিত।

গঠন : যকৃৎ লালচে বাদামি বর্ণের ত্রিকোনাকার অঙ্গ, যা **গ্লিসন ক্যাপসুল** (Glisson's capsul) নামক যোজক টিস্যু দ্বারা আবৃত। চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। যকৃৎ **ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট** (falciform ligament) নামক মেসেন্টারি দ্বারা **ডান লোব** ও **বাম লোবে** বিভক্ত। ডান লোবটি বাম লোবের চেয়ে ছয়গুণ বড়। ডান লোবটি অঙ্কীয় দিকে **কোয়াড্রেট** ও **কডেট** নামক ২টি লোবে বিভক্ত। নাশপাতি আকৃতির পিত্তাশয় বা **পিত্তথলিটি** (gall bladder) কোয়াড্রেট লোবের নিচে যুক্ত থাকে। যকৃতে সংশ্লেষিত **পিত্তরস** (bile) **সাধারণ যকৃৎ** বা **হেপাটিক নালির** মাধ্যমে বের হয়ে সাময়িকভাবে পিত্তাশয়ে জমা হয়। পিত্তাশয় **সাধারণ পিত্তনালির** মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়। পিত্তাশয় থেকে আগত পিত্তরস ডিওডেনামে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং স্নেহবস্তু পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

কুকুর ও ঘোড়ার পিত্তাশয় থাকে না।

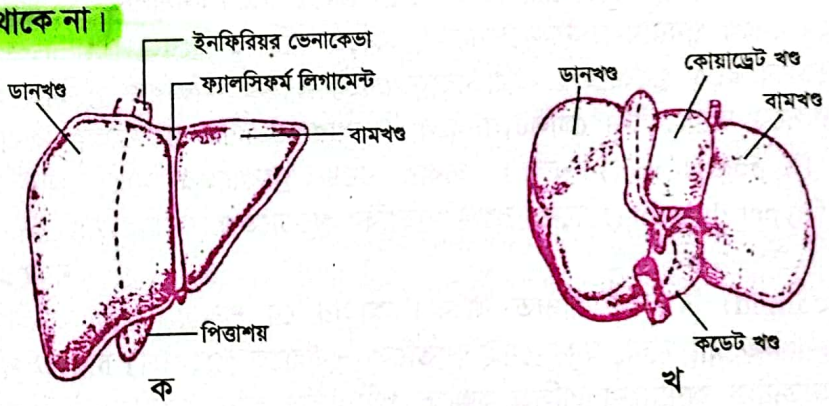

চিত্র ৩.৬ক : ক-যকৃতের পৃষ্ঠদেশ : খ. যকৃতের অঙ্কদেশ

যকৃৎ এক প্রকার ক্ষরণকারী ও রেচনকারী গ্রন্থি। যকৃতের প্রতিটি লোব (খণ্ডাংশ) অসংখ্য **লোবিউল** বা **অ্যাসিনাস** (উপখণ্ডক) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein) থাকে। প্রতিটি লোবিউল আবার অসংখ্য **হেপাটিক কোষ** (হেপাটোসাইট) নিয়ে গঠিত। এ কোষগুলো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে চাকার স্পোকের মতো সাজানো থাকে। লোবিউলের অন্তর্বর্তী স্থানে পোর্টাল শিরা, যকৃৎ ধমনি, পিত্তনালি ইত্যাদি থাকে। প্রতিটি কোষ সারির একদিকে **সাইনুসয়েড** (sinusoid) এবং অপরদিকে **পিত্তনালিকা** (bile canaliculi) থাকে। সাইনুসয়েডের গাত্রে আগ্রাসী (ফ্যাগোসাইটিক) **কুফার কোষ** (kupffer cells) থাকে। যকৃতের ডান দিক ও বাম দিক থেকে আসা **ডান** ও **বাম হেপাটিক নালি** (যকৃৎ নালি) একত্রে মিলিত হয়ে **সাধারণ বা অভিন্ন হেপাটিক নালি** গঠন করে। এটি পিত্তথলির **সিস্টিক নালির** (cystic duct) সাথে মিলিত হয়ে **পিত্তনালি** গঠন করে, যা নিচের দিক ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হয়ে **অগ্ন্যাশয় নালির** সঙ্গে যুক্ত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** বা **হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক অ্যাম্পুলা** (ampulla of vater or hepatopancreatic ampulla) গঠন করে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

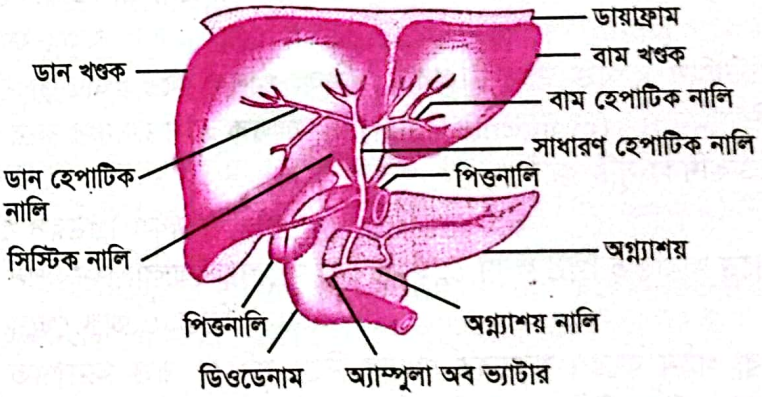

চিত্র ৩.৬খ : যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

কাজ : যকৃৎ পিত্ত ক্ষরণ করে পিত্তাশয়ে জমা রাখে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের শোষণে সাহায্য করে। তাছাড়া শর্করা, প্রোটিন ও ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্যকে পরিপাকের পর রক্তস্রোতে পাঠাতে সাহায্য করে।

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা

যকৃৎ মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিপাকগ্রন্থি, যা একটি সুসজ্জিত জৈব রসায়নাগার রূপে কাজ করে। পাকস্থলী ও অন্ত্র হতে সকল রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃৎ রক্ত থেকে পুষ্টি বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত রাখে। এছাড়া যকৃৎ বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ, ক্ষরণ সম্পৃক্ত কাজ এবং রেচনকাজও সম্পাদন করে। বিজ্ঞানীরা যকৃতে প্রায় ৫০০ ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া শনাক্ত করেছেন। যকৃতে বিভিন্ন প্রকার জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হওয়ায় বিজ্ঞানীরা যকৃৎকে সুসজ্জিত জৈব **রসায়নাগার** বা **রাসায়নিক পরীক্ষাগার** (organic laboratory/chemical laboratory) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি সব ধরনের পুষ্টি পদার্থের, যেমন– কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় বস্তুর প্রধান বিপাকীয় স্থল। যকৃতে খাদ্যকণা ও ওষুধ ভেঙে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, যা দেহ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। যকৃৎকে মৃতকোষের **কবরস্থান ও জীবনসমুদ্রের কর্মমুখর প্রোতাশ্রয়ও** বলা হয়।

(ক) যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage Functions of Liver)

১। গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) : যকৃৎ দেহের প্রধান সঞ্চয় কেন্দ্র। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি হলে যকৃৎ অতিরিক্ত গ্লুকোজকে **গ্লাইকোজেনেসিস** প্রক্রিয়ায় **গ্লাইকোজেন** হিসেবে জমা রাখে। যকৃতে প্রায় ১০০ gm গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে নিঃসৃত **ইনসুলিন** (insulin) প্রক্রিয়াটিকে উদ্দীপ্ত করে। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে পুনরায় গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে গেলে রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এ রোগকে **ডায়াবেটিস মেলিটাস** বলে। সাধারণত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি কমে গেলে তাকে **হাইপোগ্লাইসোমিয়া** (hypoglysemia) বলে। আবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে **হাইপারগ্লাইসোমিয়া** (hyperglysemia) বলে। রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের মাত্রা < 7.8 mmol/l।

২। চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat and Amino acid) : যকৃতে রক্তের অতিরিক্ত লিপিড গ্লাইকোলিপিড (glycolipid) হিসেবে সঞ্চিত থাকে। আবার যে শর্করা দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না কিংবা গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে না, যকৃৎ সেই অতিরিক্ত শর্করাকে (গ্লুকোজ) চর্বিতে পরিণত করে সঞ্চিত রাখে। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। দেহের প্রয়োজনে চর্বি ও অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়।

৩। ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamin) : যকৃৎ ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E ও K সঞ্চয় করে। ভিটামিন K রক্ত জমাটে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যকৃৎ কিছু পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন B, ভিটামিন C, ভিটামিন B_{12} (cyanocobalamin) ও ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। ভিটামিন B_{12} ও ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে।

৪। পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) : যকৃৎ পিত্তরস তৈরি করে পিত্তথলিতে (gall bladder) সঞ্চয় করে। পিত্তে অবস্থিত পিত্ত লবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যের **ইমালসিফিকেশন** ঘটিয়ে ফ্যাট পরিপাকে সহায়তা করে।

৫। রক্ত সঞ্চয় (Storage of Blood) : প্লিহা ও অন্ত্র থেকে আগত রক্তনালিগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভেতর দিয়ে যদিও রক্ত অনবরত প্রবাহিত হয় তবুও এর রক্তনালিসমূহ ও হেপাটিক পোর্টাল শিরা বিপুল পরিমাণ রক্ত ধারণ করে রক্তের **ভাণ্ডারের** (reservoir) কাজ করে। রক্তের আয়তন বেড়ে গেলে (অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে রক্ত গ্রহণ করলে) অন্যান্য শিরাসহ যকৃৎ শিরা প্রসারিত হয়ে অতিরিক্ত রক্তকে ধারণ করে। যকৃৎ প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যকৃতে বিদ্যমান **কুফার কোষ** (kupffer cells) রক্ত থেকে বিভিন্ন অণুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) ছাঁকন প্রক্রিয়ায় অপসারণ করে। এছাড়া যকৃতে রক্ত থেকে মৃত কোষ, মৃতপ্রায় লোহিত কণিকা, ক্যান্সার কোষ এবং কোষীয় বর্জ্য অপসারিত হয়।

৬। খনিজ দ্রব্য সঞ্চয় (Storage of Minerals) : লোহিত রক্তকণিকার ভাঙনে সৃষ্ট হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কুফার** (kupffer) কোষের মাধ্যমে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিনে** (globin) পরিণত হয়। হিম-এর লৌহ অংশ **ফিরিটিন** (ferritin) হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এছাড়াও সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, যেমন– কপার, জিংক, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, পটাশিয়াম, আয়রন ইত্যাদি মিনারেল স্বল্প মাত্রায় সঞ্চিত থাকে।

(খ) যকৃতের বিপাকীয় কাজ (Metabolic Functions of Liver)

১। শর্করার বিপাক (Carbohydrate metabolism)

- যকৃৎ ফ্রুক্টোজ ও গ্যালাক্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
- যকৃৎ গ্লুকোজকে **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে পরিণত করে সঞ্চিত করে। ইনসুলিনের উপস্থিতিতে প্রক্রিয়াটি উদ্দীপ্ত হয়। **ইনসুলিন** (insulin) হচ্ছে মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর **অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন যা রক্তের চিনি বা গ্লুকোজের মাত্রা কমায়।
- গ্লুকোজের চাহিদার তুলনায় যদি গ্লাইকোজেনের ঘাটতি হয়, তখন নন-কার্বোহাইড্রেট উৎস যেমন– অ্যামিনো এসিড, ল্যাকটিক এসিড, পাইরুভিক এসিড এবং গ্লিসারল থেকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (gluconeogenesis) প্রক্রিয়ায় যকৃতে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেলে দেহের প্রয়োজনে অনেক সময় যকৃৎ **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** (glycogenolysis) প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের বিপাক ঘটিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে শক্তির চাহিদা পূরণ করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অতি মাত্রায় বেড়ে গেলে যকৃৎ **লাইপোজেনেসিস** (lipogenesis) প্রক্রিয়ায় ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে অতিরিক্ত গ্লুকোজকে **ট্রাইগ্লিসারাইডে** (triglyceride=TG) পরিণত করে। যা কোষে চর্বি হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা খাদ্য গ্রহণ করলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায় যা **হৃদরোগ ও স্ট্রোকের প্রধান কারণ**।
- যকৃৎ **ক্রেবস চক্রের** (Kreb's cycle) মাধ্যমে শর্করার বিপাক ঘটিয়ে CO_2 , পানি ও প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করে।
- যকৃৎ রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য রক্ষা করে।

২। আমিষ বিপাক (Protein metabolism)

- ডিঅ্যামাইনেশন (Deamination) : যকৃৎ অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে **ডিঅ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)-এর সাথে যুক্ত হয় এবং পরিবর্তিত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে যা দেহের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। এটি দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।
- ইউরিয়া উৎপাদন (Production of urea) : যকৃতে **অরনিথিন চক্রে** (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া মিলিত হয়ে **ইউরিয়া** [$CO(NH_2)_2$] সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে এবং বৃক্ক হতে মূত্ররূপে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।
- অ্যামিনো এসিড উৎপাদন (Production of amino acid) : আবার **ট্রান্সঅ্যামিনেশন** প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ একটি অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) বহন করে অন্য এক জৈব এসিডে স্থানান্তরের মাধ্যমে অ্যামিনো এসিডের সংশ্লেষণ করে।
- প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of plasma protein) : γ- গ্লোবিউলিন ছাড়া অধিকাংশ প্লাজমা প্রোটিন যেমন– অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, α_1 ফটোপ্রোটিন এবং রক্ত জমাট বাঁধার ফ্যাক্টর, প্রোথ্রোম্বিন, ফাইব্রিনোজেন I, II, V, VII, IX, X, XI, XII ইত্যাদি যকৃতের অ্যামিনো এসিড থেকে সংশ্লেষিত হয়। এসব প্রোটিন (বিশেষ করে অ্যালবুমিন) রক্তের ভেতর দিয়ে ক্যালসিয়াম, পিত্ত লবণ ও কিছু স্টেরয়েড হরমোন বহন করে। যকৃৎ থেকে সৃষ্ট প্লাজমা প্রোটিন **প্রোথ্রোম্বিন** (prothrombin) ও **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। গ্লোবিউলিনগুলো ইমিউনতন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।
- হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of hormone) : যকৃৎ থেকে উৎপন্ন একধরনের প্রোটিন অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৩। ফ্যাট বিপাক (Fat metabolism)

- অন্ত্র থেকে শোষিত স্নেহ পদার্থ যকৃতে পৌঁছে চর্বি বা ফ্যাটে পরিণত হয়।
- শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাট সংশ্লেষ করে।
- ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, লাইপোপ্রোটিন প্রভৃতি যকৃৎ সংশ্লেষ করে।
- যকৃতে ফ্যাটের অক্সিজেন সংযোগে দহন বা অক্সিডেশনের ফলে ATP রূপে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- যকৃতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণ ঘটে, ফলে কিটোনজাত পদার্থের সংশ্লেষ ঘটে।
- শর্করার অভাবে সঞ্চিত ফ্যাট থেকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

৪। নিউক্লিক এসিড বিপাক (Nucleic acid metabolism) :

যকৃতে অ্যামিনো এসিড, গ্লুটামিন প্রভৃতির সাহায্যে পিউরিন ও পাইরিমিডিন ঘটিত নিউক্লিওটাইডগুলো সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। আবার যকৃতে পিউরিনের বিপাকের ফলে ইউরিক এসিড এবং পাইরিমিডিন বিপাকের ফলে **ইউরিয়া** উৎপন্ন হয়। যকৃতে গ্লাইসিন ও টরিন নামক অ্যামিনো এসিড হতে যথাক্রমে **গ্লাইকোকোলিক এসিড** ও **টারকোলিক এসিড** সংশ্লেষিত হয়।

৫। ভিটামিন বিপাক (Vitamin metabolism) : যকৃৎ বিটা-ক্যারোটিন হতে ভিটামিন A-এর সংশ্লেষ ঘটায়। আবার ভিটামিন K-এর সাহায্যে যকৃৎ প্রোথ্রম্বিন তৈরি করে।

৬। রক্তসংক্রান্ত কার্যাবলি (Function about blood) : ভ্রূণ অবস্থায় যকৃৎ লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় লোহিত কণিকা ধ্বংস করে। যকৃৎ **প্রোথ্রম্বিন** ও **ফাইব্রিনোজেন** সৃষ্টি করে রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। যকৃতে অবস্থিত **মাস্ট কোষ** (mast cell) **হেপারিন** (heparin) নিঃসরণ করে রক্তপ্রবাহের মধ্যে রক্ত তঞ্চনে বাধা দেয়। যকৃৎ RBC-এর হিমোগ্লোবিন ভেঙে **বিলিরুবিন** (bilirubin) ও **বিলিভার্ডিন** (biliverdin) সৃষ্টি করে। যকৃৎ লৌহ সঞ্চয় করে হিমোগ্লোবিন গঠন করে।

৭। রেচন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Function about excretion) : যকৃৎ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, টক্সিন, ব্যাকটেরিয়া, অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত ওষুধ (drugs) পিত্তের মাধ্যমে দেহ থেকে দূরীভূত করে। এছাড়া যকৃৎ বিভিন্ন প্রকার **অ্যান্টিবডি** গঠন করে।

৮। তাপ নিয়ন্ত্রণ (Control of heat) : যকৃৎ রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত অধিক উত্তাপ শোষণ করে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৯। কোলেস্টেরল ও এনজাইম উৎপাদন (Cholesterol and enzyme production) : কোলেস্টেরল বা ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে নানান প্রক্রিয়া শেষে যকৃতে কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। হার্ট অ্যাটাক (coronary thrombosis) ও স্ট্রোক (cerebral thrombosis) সংক্রান্ত জটিলতায় কোলেস্টেরল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যকৃৎ **ক্যাটালেজ** (catalase) এনজাইম উৎপন্ন করে যা কোষে সঞ্চিত বিষাক্ত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ভেঙ্গে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত করে। এছাড়াও মানুষের যকৃতে ক্যাটালেজ দ্বারা বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হয়।

১০। পিত্ত উৎপাদন (Bile production): যকৃৎ কোষ (হেপাটোসাইট) সবসময় পিত্ত বা **পিত্তরস** ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃৎ কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ যেমন– **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate), **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১১। হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormone) : যকৃৎ প্রায় সব হরমোনই কমবেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যত দ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন ইত্যাদি) তত দ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃৎ বিভিন্ন হরমোনের কর্মকাণ্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

১২। টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভেতর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন সব পদার্থকে টক্সিন (toxin) বা বিষ বলে। যকৃৎ কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বিষ প্রশমিত হয়ে যায়।

পিত্তরস বা পিত্ত (Bile)

যকৃৎ নিঃসৃত রসকে **পিত্তরস** বা **পিত্ত** বলে। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। এটি একটি হলুদাভ তরল পদার্থ। এটি তিক্ত স্বাদধারী, সামান্য ক্ষারধর্মী (pH 8.0-8.6); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010-1.011। যকৃৎ প্রতিদিন প্রায় 500-1000 মিলিলিটার পিত্তরস উৎপন্ন করে।

পিত্তরসের উপাদান

1. পানি : 89% - 98%

2. কঠিন পদার্থ : 2% -11%

(a) অজৈব পদার্থ : 0.7% - 0.8%; সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন লবণ।

(b) জৈব পদার্থ : 1.3% - 10.2%

(i) পিত্তলবণ : **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) ও **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate)।

(ii) পিত্তরঞ্জক : বিলিরুবিন (bilirubin), বিলিভার্ডিন (biliverdin)।

(iii) পিত্ত এসিড : কোলিক এসিড, লিথোকোলিক এসিড।

(c) অন্যান্য পদার্থ : কোলেস্টেরল, লেসিথিন, ফ্যাটি এসিড, মিউসিন, নিউক্লিওপ্রোটিন, মিউকাস ইত্যাদি।

পিত্তরসের কাজ : পিত্ত জীবনের পক্ষে একটি অপরিহার্য পদার্থ। পাচক এনজাইম না থাকা সত্ত্বেও এটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক বা পাচক রস হিসেবে কাজ করে। পিত্তরসের কাজগুলো নিম্নরূপ :

১। পরিপাক : পিত্তলবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশনের** মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী লাইপেজ এনজাইমকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।

২। শোষণ : চর্বি, লৌহ ও ক্যালসিয়াম, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন A, D, E ও K) ইত্যাদি শোষণের জন্য পিত্তলবণ অত্যাবশ্যক।

৩। রেচন : পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিঙ্ক, লেড, পারদ, টক্সিন, পিত্তরঞ্জক, কোলেস্টেরল, ব্যাকটেরিয়া, লেসিথিন ইত্যাদি রেচন দ্রব্য দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

৪। জোলাপ ক্রিয়া : পিত্তলবণ কোলনে পেরিস্ট্যালসিস (Peristalsis) ক্রিয়ায় উদ্দীপনা দেয়; এটি পায়খানাকে নরম করে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৫। pH নিয়ন্ত্রণ : পিত্তরসে অধিক ক্ষারকের উপস্থিতির জন্য HCl প্রশমিত হয়ে pH-এর সমতা বজায় থাকে এবং পিত্ত ডিওডেনামের pH-এর ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৬। বাফার ও লুব্রিকেন্ট : পিত্তের মিউসিন বাফার ও লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে।

এনজাইম ও পিত্তরসের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম (Enzyme)	পিত্তরস বা পিত্ত (Bile)
১। প্রকৃতি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (নালিযুক্ত গ্রন্থি) নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	যকৃৎ নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ।
২। উপাদান	পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩। অবস্থান	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে।	যকৃৎ থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে।
৪। কার্যক্ষেত্র	সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশে।	শুধুমাত্র পরিপাকনালিতে।
৫। কাজ	রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে ।
৬। পরিণতি	কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	কার্যশেষে বর্জ্যরূপে দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় উদরগহ্বরের পাকস্থলীর নিচে ডিওডেনাম ও প্লিহার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

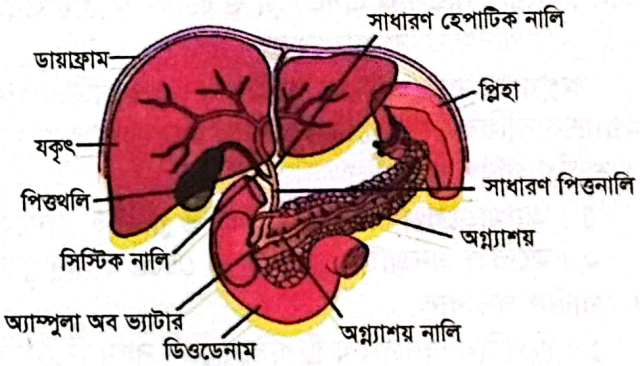

চিত্র ৩.৭ক : অগ্ন্যাশয়ের অবস্থান

গঠন : অগ্ন্যাশয় লম্বাটে, চ্যাপ্টা আকৃতির গোলাপি-ধূসর বর্ণের নরম মাংসল **মিশ্র প্রকৃতির** গ্রন্থি। এটি দেখতে অনেকটা মরিচ বা পাতার মতো। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২-১৫ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় প্রায় ৫ সেন্টিমিটার। **অগ্ন্যাশয় মস্তক, দেহ ও লেজ এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।** মস্তক অংশটি চওড়া এবং এটি ডিওডেনামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লেজ অংশটি সরু ও প্লিহা পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্তক ও লেজের মাঝের অংশটিকে দেহ বলে। অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা **উইরসাং নালি** (duct of wirsung) গঠন করে, যা অগ্ন্যাশয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর এসে **পিত্তনালির** সঙ্গে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে। অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় অগ্ন্যাশয়কে **মিশ্র গ্রন্থি** বলা হয়। অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিসমূহ–

(ক) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) : অসংখ্য **লোবিউল** (lobule) বা **অ্যাসিনাস** (acinus) নিয়ে অগ্ন্যাশয় গঠিত। প্রতিটি লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র নালি **লুমেন** এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। **লোবিউলের কোষ থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়।** লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে **প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা উইরসাং নালি** গঠন করে। লোবিউল নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ ক্ষরিত রস নালির মাধ্যমে বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিকোষগুলো ছোট ছোট নালিকার প্রান্তে আঙুরের গোছার মতো সাজানো থাকে। এগুলো রস ক্ষরণকারী **সেরাস কোষ** দ্বারা গঠিত, যা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে এনজাইম ক্ষরণ করে খাদ্য পরিপাকে ভূমিকা রাখে। অগ্ন্যাশয়ের ৯০% হলো বহিঃক্ষরা গ্রন্থির অংশ।

(খ) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine gland) : অগ্ন্যাশয়ের রস ক্ষরণকারী থলিগুলোর বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুকোনাকৃতি কোষের পুঞ্জ একত্রিত হয়ে **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets of Langerhans) বা **ল্যাঙ্গারহ্যান্স দ্বীপপুঞ্জ** গঠন করে। এটি অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স প্রায় ১০ লক্ষ কোষের একটি গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি গুচ্ছে বা পুঞ্জে চার ধরনের কোষ থাকে। যথা– (i) **আলফা কোষ** (alpha cell)- **গ্লুকাগন** (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে; (ii) **বিটা কোষ** (beta cell)- **ইনসুলিন** (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়; (iii) **ডেল্টা কোষ** (delta cell)- **সোমাটোস্ট্যাটিন** (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ অর্থাৎ রক্তে গ্লুকাগন ও ইনসুলিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং (iv) **গামা কোষ বা প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ** (pancreatic polypeptide cell = PP cell)– **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** ক্ষরণ করে যা পাকঅন্ত্রীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে ও অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। **ল্যাঙ্গারহ্যান্স** দ্বীপপুঞ্জে নালি থাকে না বলে একে **নালিবিহীন গ্রন্থি** বলে। এদের ক্ষরণ অন্তর্মুখী অর্থাৎ ক্ষরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয় বলে একে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অগ্ন্যাশয়ের ১০% হলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অংশ।

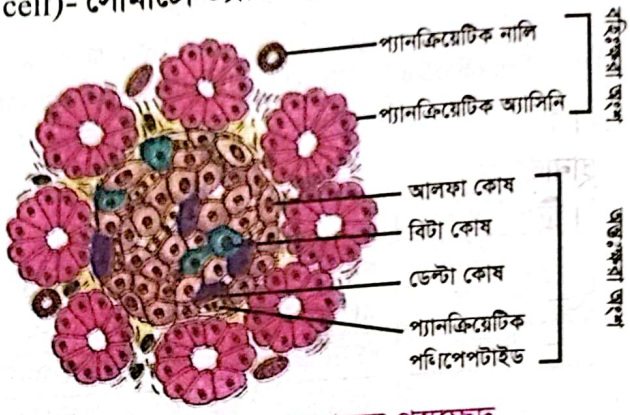

চিত্র ৩.৭খ : অগ্ন্যাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : অগ্ন্যাশয় রসের এনজাইমসমূহ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর হরমোনসমূহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কাজ (Function of Pancreas as Exocrine Gland)

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম বলতে মূলত পরিপাক কাজকেই বোঝায়। অগ্ন্যাশয় পরিপাক ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে অগ্ন্যাশয় রস বলে। এ রস **পরিপাক এনজাইম** ও **একটি ক্ষারীয় তরল** মিলে গঠিত হয়।

(ক) পরিপাক সংক্রান্ত কাজ

অগ্ন্যাশয় রসে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ পরিপাকের জন্য নানা ধরনের এনজাইম নিঃসৃত হয়, যা অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে ও খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে।

❑ শর্করা পরিপাক

১। **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

২। **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে ভেঙে ২ অণু গ্লুকোজে পরিণত করে।

❑ প্রোটিন পরিপাক

১। **ট্রিপসিন** এনজাইম **ট্রিপসিনোজেন** নামে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। এই নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে **জাইমোজেন** বলে। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টারোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয় এবং প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

২। **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

৩। **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে (পেপটোন) সরল পেপটাইডে ও অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৪। **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৫। **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৬। **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

৭। **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে (অর্থাৎ পেপটোন ও প্রোটিওজ) পরিণত করে।

৮। **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে সরল পেপটাইডে (অর্থাৎ পেপটোন ও প্রোটিওজ) পরিণত করে।

❑ স্নেহ পরিপাক

১। **লাইপেজ** : এটি চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

২। **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** : এটি পিত্তলবণের উপস্থিতিতে খাদ্যের কোলেস্টেরল ও এস্টারগুলোকে ভেঙে কোলেস্টেরল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত করে।

(খ) অপরিপাকীয় কাজ

১। **অম্ল-ক্ষারের সাম্য :** অগ্ন্যাশয় রস অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা বজায় রাখে।

২। **এসিড প্রশমন :** অগ্ন্যাশয় রস ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় এটি পাকস্থলী থেকে আগত কাইমের এসিড প্রশমিত করে আন্ত্রিক রসের কাজে সহায়তা করে।

৩। **পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ :** এটি দেহের পানিসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৪। **দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ :** অগ্ন্যাশয় রস তার নিঃসরণের দ্বারা দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **রেচন ক্রিয়া :** কয়েকটি ভারী ধাতু, প্রতিবিষ, অ্যালকালয়েড প্রভৃতি অগ্ন্যাশয় রসের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালিতে এসে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

৬। **পিচ্ছিলকরণ :** অগ্ন্যাশয়ের মিউসিনের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যস্থ খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৭। **ট্রিপসিনের ক্রিয়া দমন :** অগ্ন্যাশয় রসের ট্রিপসিন ইনহিবিটর ট্রিপসিনের ক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে।

পেপসিন ও ট্রিপসিনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পেপসিন (Pepsin)	ট্রিপসিন (Trypsin)
১। উৎপত্তিস্থল	পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পেপটিক কোষ বা চিফ থেকে উৎপন্ন হয়।	অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন হয়।
২। নিঃসরণের স্থান	পাকস্থলীতে নিঃসৃত হয়।	ক্ষুদ্রান্ত্রে (ডিওডেনামে) নিঃসৃত হয়।
৩। নিঃসরণের প্রকৃতি	নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয়ে পাকস্থলীর HCl দ্বারা সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।	নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন হিসেবে নিঃসৃত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের (ডিওডেনাম) এন্টারোকাইনেজ এনজাইম দ্বারা সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়।
৪। কাজের পরিবেশ	অম্লীয় পরিবেশে কাজ করে।	ক্ষারীয় পরিবেশে কাজ করে।
৫। ক্রিয়াস্থল	পাকস্থলীতে প্রোটিনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।	ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিনকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic Juices)

অগ্ন্যাশয়ের নালিযুক্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **অগ্ন্যাশয় রস** বলে। এটি ক্ষারীয় (pH 8.0-8.3) প্রকৃতির; আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010-1.030।

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

1. পানি : 97.6%; **2. কঠিন পদার্থ :** 2.4%

a. অজৈব উপাদান : 0.6%, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Zn^{2+}, Cl^{-1}, HCO_3^-, PO_4^{3-} ইত্যাদি।

b. জৈব উপাদান : 1.8%, বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, যথা–

i. শর্করা পরিপাককারী : অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ প্রভৃতি এনজাইম।

ii. প্রোটিন পরিপাককারী : ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ, ইলাস্টেজ, কোলাজিনেজ, নিউক্লিয়েজ, নিউক্লিওটাইডেজ ইত্যাদি।

iii. স্নেহখাদ্য পরিপাককারী : অগ্ন্যাশয় লাইপেজ।

অগ্ন্যাশয় রসের কাজ

১। এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় সমপরিমাণ পাকস্থলীয় রসকে প্রশমিত করে।

২। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৩। ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, নিউক্লিয়েজ, কার্বোক্সিপেপটাইডেজ আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৪। লাইপেজ এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

❑ **কাজ :** (i) যকৃতের গঠন ও যকৃতের ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা কর। (ii) যকৃতের পরিপাকে ভূমিকা উল্লেখ কর। (iii) অগ্ন্যাশয় কীভাবে প্রোটিন পরিপাকে ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। (iv) রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে পাতার মতো গ্রন্থিটির ভূমিকা লেখ। (v) যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে কোনটি পরিপাকে অধিক ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক মন্তব্য কর। (vi) পাকস্থলী, পিত্তথলি এবং অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় না থাকলে কী ঘটবে– বিশ্লেষণ কর। (vii) বহিঃক্ষরা গ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে কী ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা কর।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric Glands)

পাকস্থলী (Stomach) একটি থলিসদৃশ পেশিবহুল অঙ্গ। পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রের মিউকোসা (mucosa) স্তর **কলামনার** (স্তম্ভকার) এপিথেলিয়ামে আবৃত, যাতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) বিদ্যমান। এ সকল পিটে **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং বিভিন্ন ধরনের কোষ (৪/৫ ধরনের) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক প্রকার কোষের ক্ষরণ আলাদা আলাদা। যেমন- পাকস্থলীর অন্তর্গাত্রের **পেপটিক কোষ** থেকে পেপসিনোজেন, **অক্সিনটিক কোষ** হতে HCl, **মিউকাস কোষ** থেকে মিউসিন, **আরজেন্টাফিন কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর এবং **গ্যাসট্রিন কোষ** বা **জি (G) কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক রস** বা **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juices) বলে।

কাজ : গ্যাস্ট্রিক রস আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। HCl ব্যাকটেরিয়া বা রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। মিউসিন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে পাকস্থলীর প্রাচীরকে রক্ষা করে। গ্যাস্ট্রিন HCl, পেপসিন প্রভৃতির ক্ষরণ ঘটায়।

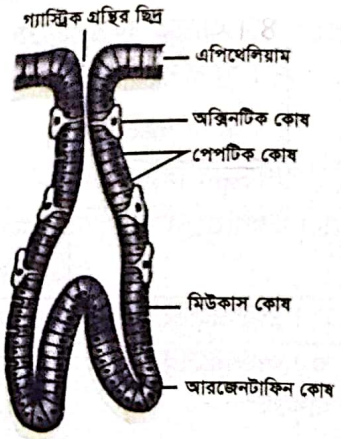

চিত্র ৩.৮ : গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

গ্যাস্ট্রিক রস (Gastric Juice)

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে **গ্যাস্ট্রিক রস** বলে। সমগ্র পরিমাণ : আহার প্রতি 500 – 1000 ml এবং প্রত্যহ 1200–1500 ml। এটি অম্লীয় (pH 0.9–1.5); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.002–1.004; ফ্রিজিং বিন্দু : 0.59°C।

গ্যাস্ট্রিক রসের উপাদান

1. পানি : 99.45% ;
2. কঠিন পদার্থ : 0.55%

a. অজৈব পদার্থ : 0.15% সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি।

b. জৈব পদার্থ : 0.40% – মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর, এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ, লাইসোজাইম, জিলাটিনেজ, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ, ইউরিয়েজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ

১। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলীতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।
২। **পেপসিন** HCl এর সঙ্গে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।
৩। **রেনিন** দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।
৪। গ্যাস্ট্রিক রস পাকস্থলীর প্রাচীরকে সুরক্ষা করে।
৫। কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালকালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক রসের সঙ্গে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal Glands)

অন্ত্রের প্রাচীরের মিউকোসা ও সাবমিউকোসা স্তরে যথাক্রমে **ক্রিপ্টস অব লিবারকুন** (crypts of lieberkuhn) এবং **ব্রুনার গ্রন্থি** (glands of brunner) নামক দু'ধরনের আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। ক্রিপ্টস অব লিবারকুন গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, ব্রাশ কোষ ও আরজেন্টাফিন কোষ নিয়ে গঠিত। ব্রুনার গ্রন্থিগুলো **ক্রিপ্টস অব লিবারকুন**-এ যুক্ত থাকে।

চিত্র ৩.৯ : আন্ত্রিক গ্রন্থি

কাজ : আন্ত্রিক রসের এনজাইমসমূহ শর্করা, আমিষ ও ফ্যাট জাতীয় অর্ধপাচ্য ও অপাচ্য বিভিন্ন খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক ও শোষণ করে।

আন্ত্রিক রস (Intestinal Juice)

আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **আন্ত্রিক রস** বা **সাক্কাস ইন্টেরিকাস** (intestinal juice or succus intericus) বলে। সমগ্র পরিমাণ : 24 ঘণ্টায় 1-2 লিটার; ক্ষারীয় (pH 6.3-9.0, গড় 8.3); আপেক্ষিক গুরুত্ব : 1.010।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

A. পানি : 98.5%; **B. কঠিন পদার্থ :** 1.5%
1. অজৈব উপাদান ঃ 0.8%; সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।
2. জৈব উপাদান ঃ 0.7%
(a) সক্রিয়ক : এন্টারোপেপটাইডেজ বা এন্টারোকাইনেজ।

(b) এনজাইম :

(i) প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম : অ্যামাইনোপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ, নিউক্লিওসাইডেজ, ইরিপসিন ইত্যাদি।

(ii) শর্করা পরিপাককারী এনজাইম : অ্যামাইলেজ, সুক্রেজ, মল্টেজ, আইসোমল্টেজ, ল্যাক্টেজ।

(iii) স্নেহদ্রব্য পরিপাককারী এনজাইম : লাইপেজ।

(vi) অন্যান্য এনজাইম : অ্যালকালাইন ফসফাটেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ।

(v) মিউসিন।

আন্ত্রিক রসের কাজ

১। আন্ত্রিক রসে বিদ্যমান মিউকাস অন্ত্রের প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

২। এর সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।

৩। এর মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

৪। এতে বিদ্যমান পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

মানুষের প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থিসমূহের নাম, অবস্থান, গঠন ও কাজ

নাম	অবস্থান	গঠন	কাজ
১। লালাগ্রন্থি (Salivary gland)	জিহ্বা ও ম্যান্ডিবলের নিচে এবং কানের পেছনে।	এরা সংখ্যায় ৩ জোড়া। যথা : (ক) প্যারোটিড (খ) সাবম্যান্ডিবুলার ও (গ) সাবলিঙ্গুয়াল	লালারস ক্ষরণ করে। লালারস প্রধানত শ্বেতসার পরিপাক করে।
২। যকৃৎ (Liver)	উদর গহ্বরে, ডায়াফ্রামের নিচে।	যকৃৎ দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। (যকৃৎকে জীবন সমুদ্রের কর্মমুখর পোতাশ্রয় বলা যায়)।	পিত্তরস ক্ষরণ করে। পিত্তরসে কোনো এনজাইম নেই। এই রস ক্ষারীয়। পিত্তরস ডিওডেনামে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে এবং চর্বিকে ফেনায় পরিণত করে।
৩। অগ্ন্যাশয় (Pancreas)	পাকস্থলীর নিচে ও ডিওডেনামের বাঁকের মধ্যস্থলে।	পাতার মতো চ্যাপ্টা, মরিচের মতো আকৃতির গ্রন্থি।	অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে। এই রসে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী প্রধানত তিন ধরনের এনজাইম থাকে। যথা : ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ।

৩.৫ পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা

(Role of Nervous System and Hormone in Digestion)

মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত **ক্ষুধা কেন্দ্র** (hunger centers) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ খাদ্য গ্রহণে উদ্দীপিত হয় যখন রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমে আসে। আমাদের পৌষ্টিকনালিতে যেসব পাচক রস নিঃসৃত হয়, সেগুলো হলো **লালারস, পাকরস** বা **গ্যাস্ট্রিক জুস, অগ্ন্যাশয় রস** ও **আন্ত্রিক রস** যা পরিপাকে ভূমিকা রাখে ।

(ক) স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা (Role of nervous system) : পাচক রসের ক্ষরণ ও খাদ্যবস্তু পরিপাক পদ্ধতি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়ায় ২টি ভিন্ন ধরনের স্নায়ু কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যথা– **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** বা **ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Intrinsic plexuses) এবং **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** বা **এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Extrinsic plexuses)।

(১) ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস (Intrinsic plexuses) : ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসকে **এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম** বা **আন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্রও** বলে যা পৌষ্টিকনালি জুড়ে বিশেষ করে অন্ননালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রাচীরে বিস্তৃত থাকে। এরা পৌষ্টিকনালির ভেতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। দুধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস বা অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যথা- (ক) **মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক** (myenteric plexuses) : এটি পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সংকোচন (বা পেরিস্ট্যালসিস) নিয়ন্ত্রণ করে। (খ) **সাব-মিউকোসাল স্নায়ুজালক** (submucosal plexuses) : এটি পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ ও স্থানীয় রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে। এ জন্য বিজ্ঞানীরা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমকে মানুষের **দ্বিতীয় মস্তিষ্ক** (second brain) নামে অভিহিত করেছেন।

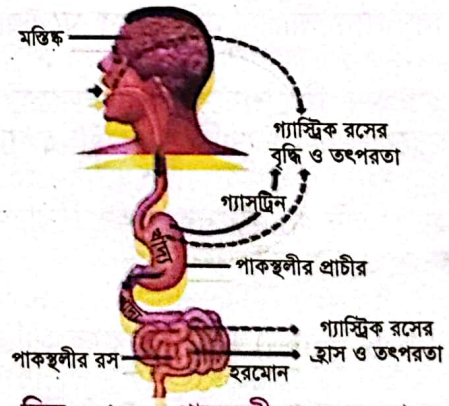

চিত্র ৩.১০ : পাকস্থলীর রস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির চিত্ররূপ

(২) এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস (Extrinsic plexuses) : এগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomous nervous system) সিমপ্যাথেটিক (sympathetic) ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক (parasympathetic) শাখা থেকে আগত এবং এরা পৌষ্টিকনালির বাইরে থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা পরিপাকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে বা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেওয়া।

স্নায়ুতন্ত্র তথা এসব স্নায়ুজালকগুলো পরিপাকের জন্য পাচক রস, এনজাইম ও হরমোন ক্ষরণ করে পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন–

১। মুখবিবরে লালা ক্ষরণ : মুখের ভেতরে খাদ্য প্রবেশ করার পর জিহ্বার স্বাদকোরক থেকে মেমোরি নিউরন স্নায়ু উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। পরে মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা মোটর নিউরনের মাধ্যমে লালাগ্রন্থিতে আসে ফলে লালাগ্রন্থি লালা নিঃসরণ করে। একে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditioned reflex) বলে। খাদ্যবস্তুর চর্বণ, গলাধঃকরণ ইত্যাদি থেকে অনপেক্ষ প্রতিবর্ত-এর উদ্ভব হয়। এ ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির ও কোনো শর্তাধীন নয়। আবার অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে ঘটে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (conditioned reflex), যেমন– আচার খাওয়ার কথায় মুখে লালা আসা। অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে সক্রিয় করে। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয়, বারবার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয়।

২। গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ : খাদ্যবস্তু মুখবিবর থেকে গলবিল ও অন্ননালি হয়ে যখন পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন পাকস্থলী প্রসারিত হয় এবং প্রসারণ গ্রাহক উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে মস্তিষ্কের নির্দেশে পাকস্থলীর মিউকোসায় অবস্থিত এন্ডোক্রিন কোষ **গ্যাস্ট্রিন** হরমোন ক্ষরণ করে, যা গ্যাস্ট্রিক জুস বা রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।

৩। আন্ত্রিক রস ক্ষরণ : ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য প্রবেশকালে এর প্রাচীরে অবস্থিত গ্রাহকগুলো উদ্দীপিত হয়। মস্তিষ্কে এই উদ্দীপনা পৌঁছালে মস্তিষ্ক পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচিত খাদ্য বা **কাইমের** নির্গমন এবং গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। ফলে একসঙ্গে অনেক বেশি খাদ্যবস্তু ও গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না এবং আন্ত্রিক রসের ক্ষরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক শুরু হয়।

৪। পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ : স্নায়বিক প্রতিবর্ত পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে ভূমিকা রাখে। এ ধরনের রস পরবর্তীতে আন্ত্রিক রসের সাথে মিশ্রিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(খ) হরমোনের ভূমিকা (Role of hormone) : খাদ্য পরিপাকে নিম্নলিখিত হরমোনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে, যেমন–

১। গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলীর পাইলোরিক অঞ্চলের গ্যাস্ট্রিন কোষ (gastrin cells = G-cells) থেকে গ্যাস্ট্রিন হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন পাকস্থলীর প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলোকে (gastric glands) **গ্যাস্ট্রিক জুস** বা রস (gastric juice) ও পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণে উদ্দীপিত করে। এটি অন্ননালি হতে পাকস্থলীতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২। সিক্রেটিন (Secretin) : এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন। **সিক্রেটিন** অন্ত্রের বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রসে নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলীর প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃৎকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোন গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ ও পাকস্থলীর চলনও হ্রাস করে।

৩। এন্টারোগ্যাস্ট্রোন (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide– GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলীর বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে **গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড** বলা হয়।

৪। এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin) : এটি ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম ক্ষরিত হয়।

৫। কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin - CCK) : এই হরমোন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পিত্তাশয়কে পিত্ত ক্ষরণে, অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশে এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোনকে **কোলেসিস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজাইমিনও** (Cholecystokinin Pancreozymin - CCK-PZ) বলা হয়।

৬। সোমাটোস্টাটিন (Somatostatin) : এটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত **ডি-কোষ** থেকে নিঃসৃত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণও হ্রাস করে।

৭। এন্টারোক্রাইনিন (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এটি **লিবারকুন গ্রন্থিকে** (crypts of lieberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৮। ডিওক্রাইনিন (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন **ব্রুনারের গ্রন্থিকে** উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯। পেপটাইড YY (Peptide YY) : এই হরমোন ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

১০। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide = PP) : এই হরমোন আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১। ভিল্লিকাইনিন (Villikinin) : এই হরমোন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

১২। ভেসোয়াটিক ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive intestinal peptide-VIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলো প্রসারিত হয় এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ হয়।

❑ **কাজ :** মানুষের খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের পাশাপাশি হরমোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

খাদ্য পরিপাকে সহায়তাকারী হরমোনের সংক্ষিপ্তসার

হরমোন	উৎস	কাজ
১। গ্যাস্ট্রিন	পাকস্থলীর পাইলোরিক অঞ্চল	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণ উদ্দীপিত করে। এটি অন্ননালি হতে পাকস্থলীতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
২। সিক্রেটিন	ডিওডেনাম	এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলীর প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃৎকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এই হরমোন গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ ও পাকস্থলীর চলনও হ্রাস করে।
৩। এন্টারোগ্যাস্ট্রোন	ডিওডেনাম	পাকস্থলীর বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে।
৪। এন্টেরোকাইনিন	ইলিয়াম	এর প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম ক্ষরিত হয়।
৫। কোলেসিস্টোকাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	পিত্তাশয়কে পিত্ত ক্ষরণে, অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশে এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।
৬। সোমাটোস্টাটিন	পাকস্থলী ও অন্ত্রের ডি-কোষ	এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণও হ্রাস করে।
৭। এন্টারোক্রাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	লিবারকুন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।
৮। ডিওক্রাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।
৯। পেপটাইড YY	ইলিয়াম	এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।
১০। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড	প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ	অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।
১১। ভিল্লিকাইনিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	ভিলাই-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
১২। ভেসোয়াটিক ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড	ক্ষুদ্রান্ত্র	অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

৩.৬ খাদ্যসার শোষণ বা পরিশোষণ
(Absorption of Digested Nutrients)

পরিপাকের ফলে অদ্রবণীয় জটিল খাদ্যবস্তু দ্রবণীয় খাদ্যসারে পরিণত হয়, যা ক্ষুদ্রান্ত্রের কোষ দ্বারা শোষিত হতে পারে। খাদ্যের পুষ্টি অনুগ্রহণের প্রক্রিয়াকে সাধারণ শোষণ (absorption) বলা হয়। **প্রায় ৯০% শোষণ ক্ষুদ্রান্ত্রে ঘটে।** তবে পাকস্থলী ও বৃহদন্ত্রে কিছু (১০%) খাদ্যসার শোষিত হয়। পাকস্থলীতে কিছু ওষুধ এবং অ্যালকোহলের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই শোষণ হয় না। কারণ পাকস্থলীতে খাদ্য সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয় না এবং এতে ভিলাই অনুপস্থিত। বৃহদন্ত্রে বেশির ভাগ পানি শোষিত হয়। বিভিন্ন হরমোন খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্রান্ত্র শোষণের প্রধান স্থান। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশ অর্থাৎ ডিওডেনাম এনজাইম ক্ষরণ করে শর্করা, প্রোটিন ও লিপিড জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটায়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশ (জেজুনাম ও ইলিয়াম) শোষণকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত। পরিচিত সকল খাদ্য এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশে জমা হয়। শর্করা ও প্রোটিনের সরল উপাদানগুলো ভিলাসের মধ্যে অবস্থিত রক্তনালিতে শোষিত হয় এবং প্রোটিন সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। ফ্যাটের সকল উপাদান **ল্যাকটিয়ালের** মধ্যে শোষিত হয় এবং লসিকাতন্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের ভাঁজে ভাঁজে নড়াচড়ায় সক্ষম ভিলাই নামক অভিক্ষেপ বিদ্যমান। **ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই হলো শোষণ একক।** মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে (১০ বর্গমিটার ক্ষেত্রতলে) প্রায় **৫০ হাজার** (৫০,০০০) ভিলাই থাকে। এ ছাড়া ভিলাস গঠনকারী এপিথেলিয়াল কোষের প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা **মাইক্রোভিলাই বা ব্রাশবর্ডার** নামক অভিক্ষেপ সৃষ্টি ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে শোষণ অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ৭০ কেজি ওজনের একজন মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে গড়ে প্রায় ১০০ বর্গমিটার শোষণ অঞ্চল থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তুর শোষণ বর্ণনা করা হলো–

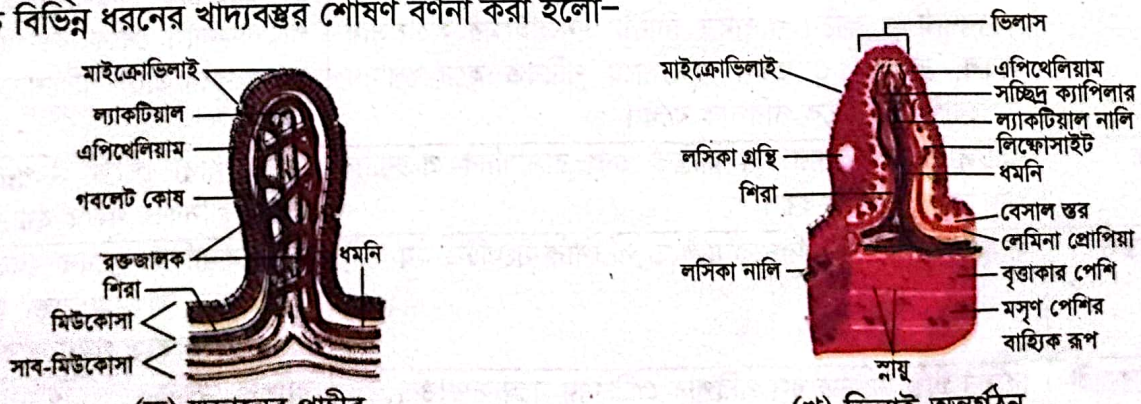

চিত্র ৩.১১ক : ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন

১। **শর্করা শোষণ** (Absorption of Carbohydrate) : শর্করা প্রধানত **মনোস্যাকারাইড** রূপে শোষিত হয়। শর্করা পাচিত হলে যেসব সরল খাদ্য উৎপন্ন হয় সেগুলো হলো গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি। এসব সরল খাদ্য উপাদান ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে শোষিত হয়ে পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। পোর্টাল শিরা দ্বারা শোষিত খাদ্যসার যকৃতে মুক্ত করে। **ইনসুলিন** ও **গ্লুকোকর্টিকয়েড** হরমোন শর্করা শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যাকটিক এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে।

২। **প্রোটিনের শোষণ** (Absorption of Protein) : প্রোটিন **অ্যামিনো এসিডরূপে** কোষে শোষিত হয়। সাধারণত এল-অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয় পদ্ধতিতে এবং ডি-অ্যামিনো এসিডগুলো ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষিত হয়। পেপটোন, প্রোটিওজ, পেপটাইড ইত্যাদি অর্ধজটিল প্রোটিনও খুব অল্প পরিমাণ শোষিত হয়। ডিমের সাদা অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে কিছু পরিমাণ শোষিত হয়। চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদির প্রোটিন অপরিবর্তিত অবস্থায় অল্প পরিমাণ ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়ে রক্তে মিশে যায়। ফলে অনেক সময় অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশ পায়। **থাইরক্সিন** হরমোন প্রোটিন শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **লিপিডের শোষণ** : পিত্তরস ও লাইপেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় চর্বি মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। মনোগ্লিসারাইড ও কিছু ফ্যাটি এসিড পিত্তরসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্নেহকণা (fat droplets) বা **মাইসেলি** (micelle) নামক আণুবীক্ষণিক কণা সৃষ্টি করে। অন্যান্য ফ্যাটি এসিডসহ মাইসেলি ব্যাপনের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে। কোষের ভেতরে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পুনরায় যুক্ত হয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড গঠন করে। তবে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উভয় অণু আমিষের আবরণ দ্বারা পৃথক থাকার কারণে পরস্পর মিশে যায় না।

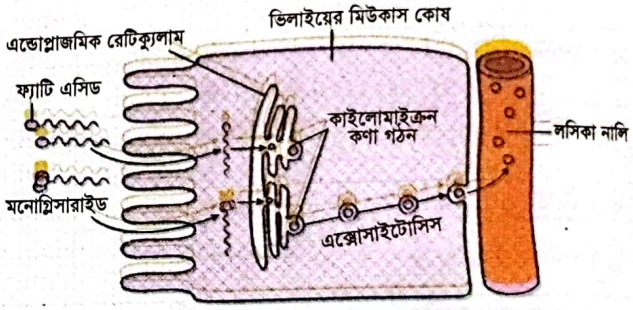

চিত্র ৩.১১খ : অন্ত্রে খাদ্যসার শোষণ (ফ্যাটি এসিড)

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের এই অণুকে **কাইলোমাইক্রন** (chylomicron) বলে। সাদা বর্ণের কাইলোমাইক্রন কণাগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বা **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis) প্রক্রিয়ায় আবরণী কোষ ত্যাগ করে ভিলাইয়ের **ল্যাকটিয়েলে** (lacteal, অর্থ সাদাটে) প্রবেশ করে। লিপিডের শোষণ মূলত ডিওডেনাম ও জেজুনামের প্রথম অংশে সম্পন্ন হয়। **থাইরক্সিন** হরমোন লিপিড শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। **পানি শোষণ** : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থান। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ২০০-৪০০ মিলিলিটার পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

৫। **খনিজ লবণ শোষণ** : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে অধিকাংশ খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬। **ভিটামিন শোষণ** : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই কর্তৃক পানি বা চর্বিতে দ্রবীভূত হয়ে ভিটামিন শোষিত হয়। সাধারণত ভিটামিন A, D, E, K শোষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ পিত্তলবণ সহায়তা করে। তবে ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

পরিপাক এবং পরিশোষণ-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পরিপাক (Digestion)	পরিশোষণ (Absorption)
১। সংজ্ঞা	যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও কঠিন খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ উপযোগী হয় তাকে পরিপাক বলে।	যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিপাকনালি থেকে রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে পরিশোষণ বলে।
২। পরিণতি	জটিল খাদ্য গ্রহণের পর যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যসারে পরিণত হয়।	জটিল খাদ্য থেকে উৎপন্ন খাদ্যসার রক্ত ও লসিকায় গৃহীত হয়।
৩। সংঘটনস্থল	খাদ্য গ্রহণের পর পরিপাকনালিতে পরিপাক সংঘটিত হয়।	পরিপাকনালির লুমেন থেকে অন্ত্রের ভিলাইয়ের মাধ্যমে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং লসিকাতন্ত্রে গমন করে।
৪। অংশগ্রহণকারী	বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত রস পরিপাক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।	ব্যাপন, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহন পরিশোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক :

পরিপাকস্থল	পরিপাক গ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাকরসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান উৎপন্ন বস্তু
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত 'লালারস'	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী**		
		১. টায়ালিন	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন	মল্টোজ
		২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	মল্টোজ	গ্লুকোজ
পাকস্থলী	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত 'পাকরস'	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. পেপসিন	প্রোটিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন
		২. জিলেটিনেজ	জিলেটিন	পেপটোন ও পলিপেপটাইড
		৩. রেনিন	দুগ্ধ কেসিন	প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	লিপিড	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত 'অগ্ন্যাশয় রস'	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. ট্রিপসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন	পলিপেপটাইড
		২. কাইমোট্রিপসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন	পলিপেপটাইড
		৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ	পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ	সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড
		৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পলিপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৫. ট্রাইপেপটাইডেজ	ট্রাইপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৬. ডাইপেপটাইডেজ	ডাইপেপটাইড	অ্যামিনো এসিড
		৭. কোলাজিনেজ	কোলাজেন	সরল পেপটাইড
		শর্করা পরিপাককারী		
		১. অ্যামাইলেজ	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন	মল্টোজ
		২. মল্টেজ	মল্টোজ	গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	চর্বি (লিপিড)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
		২. ফসফোলাইপেজ	ফসফোলিপিড	ফ্যাটি এসিড
		৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	কোলেস্টেরল এস্টার	ফ্যাটি এসিড
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত মেমব্রেন এনজাইমসমূহ	**প্রোটিন পরিপাককারী**		
		১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পেপটাইড অণু	অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী		
		১. লাইপেজ	ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড	মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড
		২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	ফসফোলিপিড	গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন- কোলিন)
		কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী		
		১. ল্যাক্টেজ	ল্যাক্টোজ	গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ
		২. মল্টেজ	মল্টোজ	গ্লুকোজ
		৩. সুক্রেজ	সুক্রোজ	গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
		৪. অ্যামাইলেজ	স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী		
		১. নিউক্লিয়েডেজ	নিউক্লিক এসিড	মনোনিউক্লিওটাইড
		২. নিউক্লিওটাইডেজ	নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ
		৩. নিউক্লিওসাইডেজ	নিউক্লিওসাইড	পেন্টোজ সুগ্যার ও নাইট্রোজেন বেস

শোষিত খাদ্যসার পরিবহন (Transportation of Absorbed Nutrients)

পরিপাকনালিতে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসার অন্ত্রের ভিলাসের কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ভিলাসের অভ্যন্তরে **কৈশিক জালক** (capillaries) এবং **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) থাকে। গ্লুকোজ ও অ্যামিনো এসিড ভিলাসের কোষ থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে কৈশিকনালিতে আসে। অতঃপর এরা হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে আসে এবং যকৃৎ থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে শরীরের বিভিন্ন কোষে পরিবাহিত হয়। চর্বি ও ফ্যাটি এসিড ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে। এ সময়ে ল্যাকটিয়েল সাদা দেখায়। ল্যাকটিয়েল থেকে এরা থোরাসিক লসিকানালির (thoracic lymphatic canal) মাধ্যমে বাহিত হয়ে শিরাতন্ত্রের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যকৃৎ হয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায়।

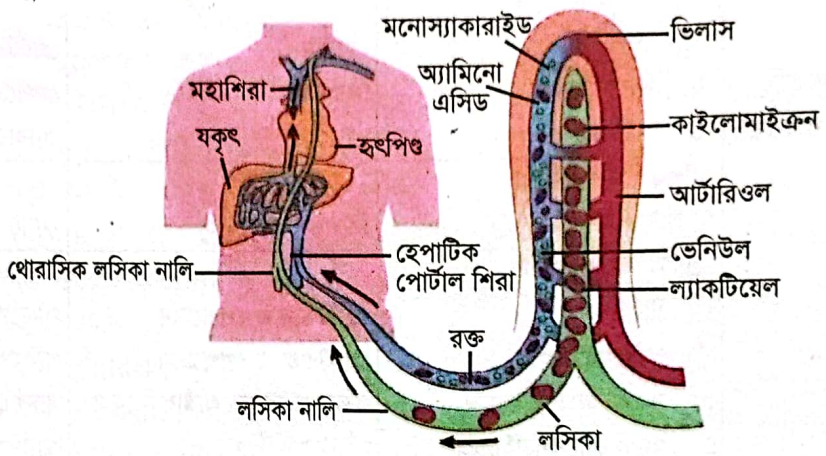

চিত্র ৩.১১গ : অন্ত্রের প্রাচীর (ভিলাই) থেকে রক্তনালির মাধ্যমে দেহে খাদ্যসার পরিবহন

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of Absorbed Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ, শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিছু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের মেটালিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

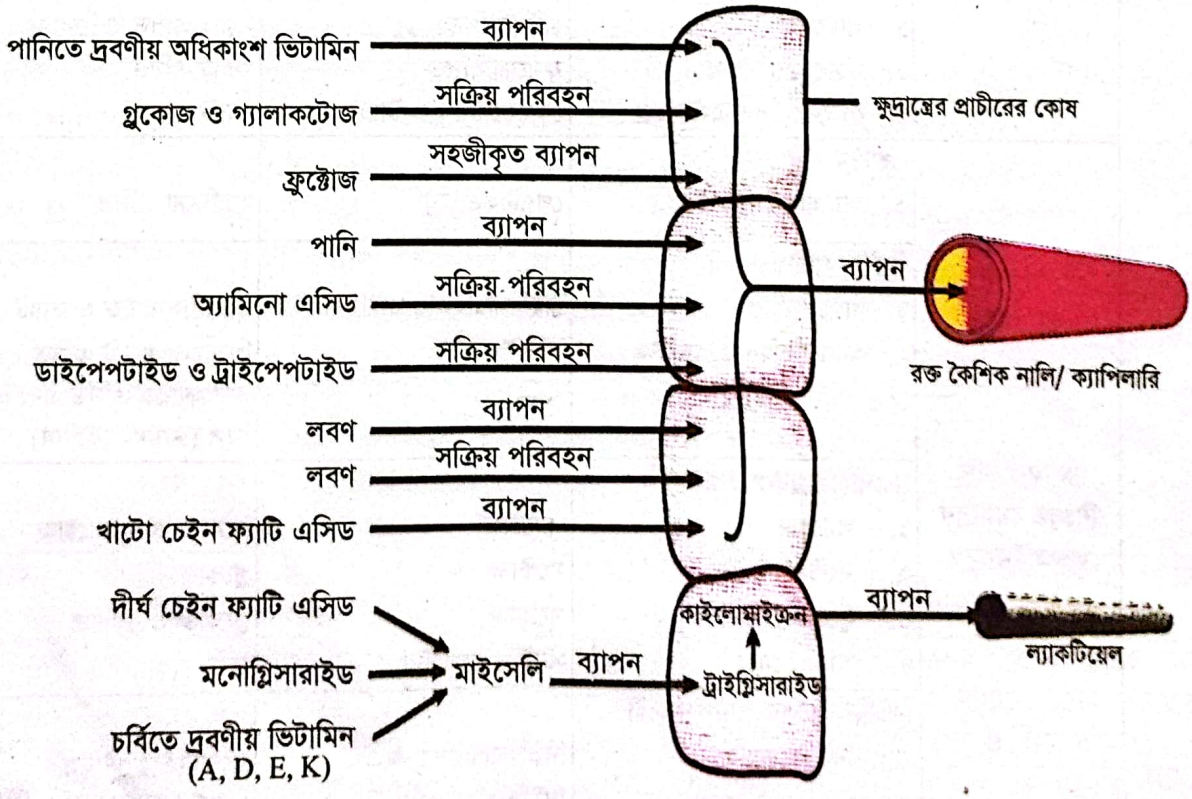

চিত্র ৩.১২ : অন্তঃপ্রাচীরের মাধ্যমে হজমকৃত খাদ্যসারের শোষণ ও পরিবহন

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। কিছু ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ারমেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

❐ **শোষিত খাদ্যসারের পরিবহন ও পরিণতির প্রবাহচিত্র :**

১. গ্লুকোজ —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি উৎপাদন

২. অ্যামিনো এসিড —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ

৩. ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল —সক্রিয় পরিবহন→ অন্ত্রের ভিলাস → ল্যাকটিয়েল → থোরাসিক লসিকা নালি → শিরাতন্ত্র → যকৃৎ → হৃৎপিণ্ড → কোষ → শক্তি সঞ্চয়

৩.৭ বৃহদন্ত্রের কাজ (Functions of Large Intestine)

মানুষের পৌষ্টিকনালির ইলিয়ামের শেষপ্রান্ত হতে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। এটি মোটা, নলাকৃতির ও খাঁজযুক্ত। এর দৈর্ঘ্য ১.৫-২.০ মিটার এবং প্রস্থ ৪-৭ সেন্টিমিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। সম্মুখের জিজুনাম সংলগ্ন স্ফীত গোলাকৃতির অংশকে **সিকাম** (caecum), মধ্যবর্তী 'U' আকৃতির বৃহৎ অংশকে **কোলন** (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলে আকৃতির অংশকে **মলাশয়** (rectum) বলে। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে। একে **অ্যাপেনডিক্স** (appendix) বলে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহ সৃষ্টি হলে একে **অ্যাপেনডিসাইটিস** (appendicitis) বলে। **বৃহদন্ত্রে কোনো পাচক রস ক্ষরিত হয় না বলে এখানে খাদ্যের পরিপাক ঘটে না।** কিন্তু এই অংশে মিউকাসসহ এক প্রকার জলীয় তরল নির্গত হয়। বৃহদন্ত্র বিভিন্ন প্রকার কাজ করে থাকে। নিচে মানুষের বৃহদন্ত্রের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করা হলো–

১। খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : খাদ্যের অপাচ্য অংশ সাময়িকভাবে বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত থাকে। ইলিয়াম থেকে অপরিপাককৃত খাদ্যবস্তু পানিসহ সিকামের মাধ্যমে কোলনে আসে। অপাচ্য খাদ্যবস্তু এখানে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা থাকে।

২। ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে **গবলেট কোষ** মিউকাস ক্ষরণ করে এবং বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরকে পিচ্ছিল রাখে।

৩। শোষণ : খাদ্যের অপাচ্য অংশের প্রায় শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি বৃহদন্ত্রের কোলন দ্বারা পুনঃশোষিত হয়। এ ছাড়া গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, অজৈব লবণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন-K এবং ভিটামিন-B এখানে শোষিত হয়।

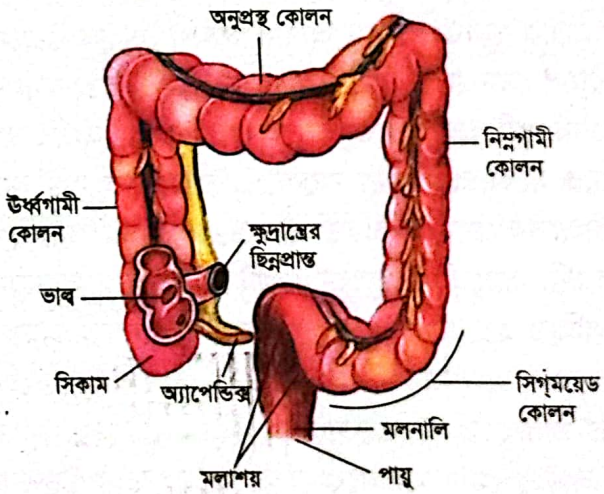

চিত্র ৩.১৩ : মানুষের বৃহদন্ত্র

৪। মল উৎপাদন : বৃহদন্ত্রে পানি, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লবণ ইত্যাদি শোষণের পর ৩৫০ গ্রাম তরল মণ্ড (chyle) থেকে ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়।

৫। ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া : বৃহদন্ত্রে অনেক মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতি) থাকে। এরা খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও অপাচ্য পলিস্যাকারাইডকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙে অ্যাসিটিক এসিড, প্রোপাওনিক এসিড, বিউটারিক এসিড ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি এসিড

(short-chain fatty acids-SCFAs) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস মুক্ত করে। ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি এসিড ব্যাকটেরিয়া এবং কোলনের প্রাচীরের কোষে শক্তি জোগায়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ফলিক এসিড, ভিটামিন-K এবং ভিটামিন-B_{12} উৎপন্ন করে।

৬। সঞ্চালনমূলক কাজ : বৃহদন্ত্রের ক্রমসংকোচনের ফলে কোলন, পেলভিক কোলন ও মলাশয় হতে অর্ধকঠিন মল পায়ু পথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

মলত্যাগ (Defecation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে মলাশয় থেকে পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে মলত্যাগ বা মল নির্গমন বা ডেফিকেশন বা ইজেসশন বলে।

খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত, পুষ্টিমূল্যহীন খাদ্য বস্তুকে **রাফেজ** (Roughage) বলে। এই রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) রূপে কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা থাকে। এই সময় বাক্যটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস যেমন- হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী** (defecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে পেরিস্টালসিস শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সংকোচনের ফলে পায়ুনালির ভেতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ুপথে দেহের বাইরে বের হয়ে আসে। সুস্থ স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষ সাধারণত দিনে একবার কিংবা দু'বার, আর শিশুরা একাধিকবার মল ত্যাগ করে।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৩.৮ স্থূলতা (Obesity)

ইংরেজি Obesity শব্দটি ল্যাটিন শব্দ *obesitus* থেকে উদ্ভূত, যার আভিধানিক অর্থ মোটা। স্থূলতা বলতে বোঝায় দেহে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চয়। অন্যভাবে বলা যায়, **দেহে মাত্রাতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে অস্বাভাবিকভাবে মুটিয়ে যাওয়াকে স্থূলতা বলে।** আবার **আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকেও স্থূলতা বলা হয়।** এটি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের পুষ্টিগত অস্বাভাবিক অবস্থা। শক্তি অর্থাৎ ক্যালরি গ্রহণ এবং ক্যালরি ব্যয়ের মধ্যে অসাম্যের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত প্রতি ৯.৩ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে ১ গ্রাম করে চর্বি জমা হয়। স্থূলতা একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি সাধারণত ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং মধ্যবয়সে ওজন বৃদ্ধি সর্বাধিক হয়। দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিপাকীয় চাহিদা ও শক্তিগ্রহণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন ওজন স্থিতাবস্থায় থাকে। একবার ওজন বেড়ে গেলে ৬৫ বছর বয়সের আগে সহজে হ্রাস পায় না। বিশ্বব্যাপী স্থূলতা সাধারণত দেহভর সূচক বা বিএমআই (BMI) দ্বারা নিরূপণ করা হয়।

চিত্র ৩.১৪ : একজন স্থূলতাসম্পন্ন ব্যক্তি

ব্যক্তির মোট ওজনকে (কিলোগ্রাম) তার উচ্চতার (মিটার) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে দেহভর সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স বা BMI (Body Mass Index) **বলে।** নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে BMI নির্ণয় করা যায়।

$$\text{BMI} = \frac{\text{দেহের ওজন (Kg)}}{\text{দেহের উচ্চতা } (\text{m}^2)}$$

অর্থাৎ বিএমআই = কিলোগ্রাম/বর্গমিটার (*BMI= Kilograms/meters*^{2})। এ হিসেবে 1.25 মিটার (125 সেন্টিমিটার) উচ্চতা ও 55 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির BMI হচ্ছে প্রায় 35.20। একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI-এর বিস্তৃতি হলো 25 – 29.99 পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান 30 বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে **স্থূলকায় বা মোটা** বলা যাবে।

পাশাপাশি এই মান 18.5 এর নিচে হলে তাকে নিম্নমাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি 50 – 100 হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা **ব্যাধিগ্রস্ত বীভৎস স্থূলতা** বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) 2000 সালে BMI-এর যে মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে তা দিয়ে খুব সহজেই মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়।

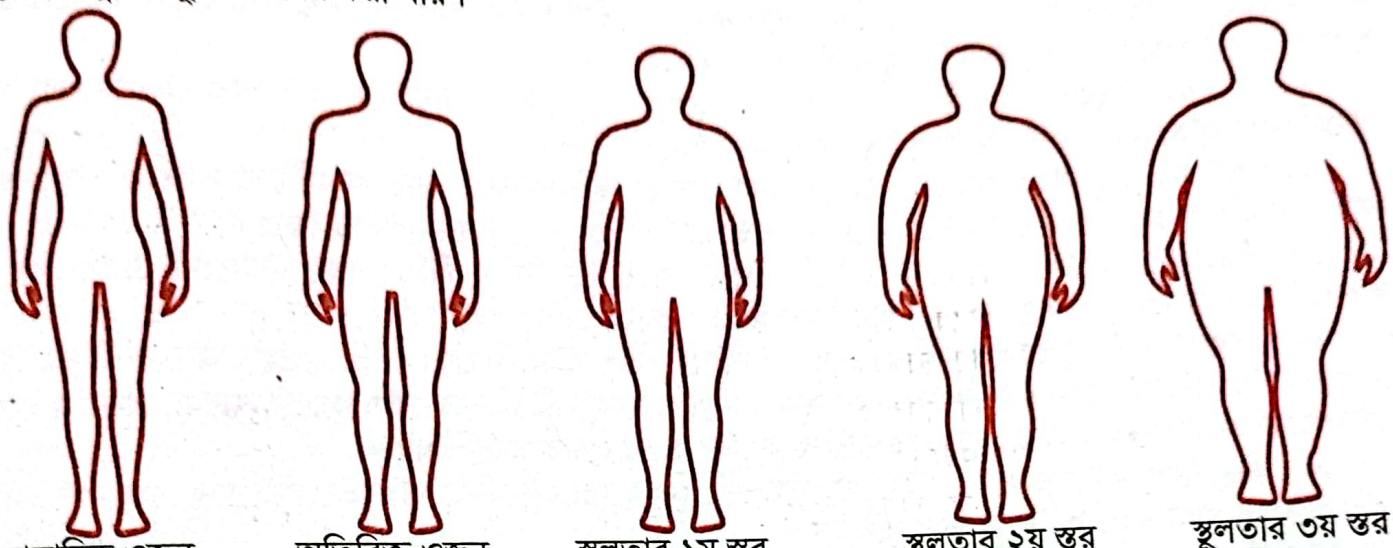

চিত্র ৩.১৫ : BMI নির্ণয়

BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
১	$< 18.5\ kg/m^2$	শরীরের ওজন কম (Under weight)
২	$18.5 – 24.99\ kg/m^2$	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
৩	$25.0 – 29.99\ kg/m^2$	অতিরিক্ত ওজন (Over weight)
৪	$30.0 – 34.99\ kg/m^2$	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
৫	$35.0 – 39.99\ kg/m^2$	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
৬	$\geq 40.0\ kg/m^2$	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে **বেরিয়াট্রিকস** (bariatrics) বলে।

স্থূলতার কারণ (Causes of obesity)

১। **অভ্যাসগত বিষয়** (Behavioural factors) : বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থূলতার প্রধান কারণ কর্মতৎপরতা হ্রাস। এছাড়া অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ, শক্তিবহুল (energetic) খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ, মদ্যপান ইত্যাদি ওজন বৃদ্ধির কারণ।

২। **জিনগত বিষয়** (Genetic factors) : একটি মাত্র জিনগত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট স্থূলতা কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মেলানোকর্টিন-রিসেপ্টরের মিউটেশন, **প্রাদার উইলি সিনড্রোম** (Prader-Willi syndrome এক প্রকার জিনগত রোগ। এর লক্ষণগুলো হলো অস্বাভাবিক চালচলন, লক্ষণীয় স্থূলতা, মানসিক বিকলতা ইত্যাদি) এবং **লেপটিন** (এক ধরনের হরমোন যা দৈহিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করে) জিনের মিউটেশন। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়

৩। **ওষুধের প্রভাব** (Certain medication) : স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ (কার্টিকোস্টেরয়েডস), অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (অবসন্ন দূর করার ওষুধ), জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ইত্যাদি সেবন অনেক সময় দৈহিক স্থূলতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

৪। **অসুস্থতা** (Sickness) : **পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম** (Polycystic ovary syndrome) হলে নারীর দেহে স্থূলতা দেখা দেয়। এ ছাড়া **কুসিং সিনড্রোম** (Cushing syndrome), **হাইপারথাইরয়েডিজম** (Hyperthyroidism) হলে স্থূলতা সৃষ্টি হতে পারে।

৫। **গর্ভাবস্থা** (Pregnancy) : গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার স্বভাবতই ওজন বাড়ে; কিন্তু সন্তান প্রসবের পর অনেক মহিলা সেই বাড়তি ওজন কমাতে পারে না, ফলে স্থূলতা বাড়ে।

৬। **বংশগত কারণ** (Genetic cause) : একই পরিবারের বিভিন্ন জনুর সদস্যদের মাঝে ধারাবাহিক স্থূলতা বির করে। এমনকি যমজ ভাইবোনদের ক্ষেত্রেও এর তারতম্য হয় না। কারণ এদের মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় সে জিন নিয়ন্ত্রিত।

৭। **মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) বিষয় ও মানসিক আঘাত :** অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ও মানসিক আঘাতের কারণেও স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

৮। **পারিবারিক জীবনযাত্রা :** পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে ওঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সবজি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা, দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৯। **আবেগ :** বিষণ্ণতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা (হীনম্মন্যতা) কিংবা অন্য কারণে অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

১০। **কর্মক্ষেত্র :** চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে একটানা বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

১১। **বিশ্রাম :** বিশ্রামের সময় বাসায় বসে রিমোট-কন্ট্রোলড কেবল টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

১২। **লিঙ্গভেদে :** গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১৩। **নিদ্রাহীনতা :** রাতে ৬-৭ ঘণ্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

১৪। **শিক্ষার অভাব :** সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১৫। **অন্যান্য কারণ (Other causes) :** টিভি বা কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, দীর্ঘসময় অফিসিয়াল কাজ করা, হাঁটার পরিবর্তে গাড়ি ব্যবহার করা ওজন বৃদ্ধি বা স্থূলতার অন্যতম কারণ।

ওজন বৃদ্ধিজনিত বিভিন্ন সমস্যা : ওজন বৃদ্ধির ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে :

ডায়াবেটিস মেলিটাস (টাইপ-২), উচ্চ রক্তচাপ (hypertension), স্ট্রোক (stroke), করোনারি হৃদরোগ, গল স্টোন (gall stone), ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি (কোলন ও স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি), যকৃৎ ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া (ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হওয়া), হাঁপানি (শ্বাস-প্রশ্বাসে ত্রুটি), হার্নিয়া, পায়ের শিরা ফুলে ওঠা (ভেরিকোসভেইন), ত্বক কালো হয়ে যাওয়া, ঋতুচক্রে ত্রুটি, বন্ধ্যত্ব, জরায়ুর সিস্ট, গিঁট বাত বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস (অস্থিসন্ধির প্রদাহ) ইত্যাদি। স্থূলতার ফলে অনেক সময় মৃত্যুঝুঁকিরও সম্ভাবনা দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা দেহের ওজন উচ্চতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শারীরিক সৌন্দর্য বলতে কিছু থাকে না।

স্থূলতা থেকে পরিত্রাণের উপায় : একজন স্থূলতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থূলতার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক বা ডায়েটিশিয়ান রোগীর ওজন, লিঙ্গ ও বয়সের কথা ভেবে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য তালিকা তৈরি করে দেবেন, যা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সাধারণত শক্তি খরচের চেয়ে 600 Kcal কম শক্তিসম্পন্ন মাঝারি ধরনের খাবার নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো–

১। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম বাড়াতে হবে।

২। টিভি বা কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা ও দীর্ঘসময় অফিসিয়াল কাজ করা যাবে না।

৩। স্ন্যাক ও মিষ্টি জাতীয় লোভনীয় খাবার পরিহার করতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন একটানা ৩০ মিনিট হাঁটা প্রয়োজন, যা প্রতি মাসে ১ কেজি করে ওজন হ্রাস করে।

৫। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী Orlistat (Xenical), Suprenza (Phentermine), Lorcaserin (Belviq) ইত্যাদি ওষুধ ব্যবহার করলে স্থূলতা থেকে পরিত্রাণের ভালো ফল পাওয়া যায়।

৬। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন কিংবা ওষুধে স্থূলতা না কমলে প্রয়োজনে **ল্যাপারস্কোপি** (laparoscopy), **গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি, গ্যাস্ট্রিক স্লিভ** (gastric sleeve) ইত্যাদি **ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি** (bariatric surgery) করে স্থূলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

৭। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (GI) হরমোন স্থূলতা দ্রুত হ্রাসকরণে ম্যাজিক বুলেট (magic bullet) হিসেবে কাজ করে।

❑ **কাজ :** (i) অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণই BMI বাড়ার একমাত্র কারণ নয়– ব্যাখ্যা কর। (ii) মানুষের শারীরিক সমস্যা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। (iii) লিপিড জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলা উচিত– ব্যাখ্যা কর।